আজ কাল পরশুর গল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ পাবলিশার্স
৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা—১৭

প্রথম মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৭

প্রকাশক
নরেন মল্লিক
৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা

মুদ্রাকর
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিঃ
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট
নরেন মল্লিক

ব্লক নির্ম্মাণ
ক্যালকাটা ফটোটাইপ স্টুডিও
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা

দাম—দুই টাকা

আজ কাল পরশুর গল্প

আজ কাল পরশুর গল্প

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরোনো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়ি-কলসিগুলি পর্য্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকো থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদ'র বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সাঁথির সিঁদূরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গিতে আর চলন-ফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভূষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন সহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে,

শাড়ীখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানস্থকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকরুণরা রামপদ'র বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদ'র ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল ?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কি না ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না নেকে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' যোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না 'তুই থাম ছোঁড়া' বলে'। তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরাকর ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকা-বাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষা-ভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্য্যন্তই পৌঁছয়। বয়স্কারা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। স্নুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা বুঝি শেষ পর্য্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দেবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা-পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাঃ বাঃ বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পোরোবার জন্য পাতা তাল গাছের কাণ্ডটার এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা!'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে! শুনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক স্বম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এলিয়ে যায়।

'ডাকছে? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি? যাইলো গিরি, যাই!'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে যোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার, সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিট-পিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দ্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্ব্বাঙ্গ-জোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেল না কেন রামপদ ?'

'তাই তো মস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভুষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল

ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য ক'জন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদ'র। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু !

নৌকোতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁঠাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদ'র মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন ছ্যাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। এক জন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ লোক রামপদ'র পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কর্ত্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। ছু'চার জন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কিছু দিন, ছু'-চার জন হয়তো বর্জ্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড ? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মটে ছু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামী করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা ? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু

ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ ?'

'আজ্ঞে আপনারা ?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে হু'টি খেতে দাওতো তুমি : চালাটা তোলোনি কেন ?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে হু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদ'র সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। গ্রামের এক জন কর্ম্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তাঁর এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে ?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখোছো !' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু ?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশী রয়ে' রয়ে' অল্প হু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার

মনে আসে : ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়। আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জ্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তা'র।

'শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে।

এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝালো সুরে।—'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে : রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন-পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারীর পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদ'র ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় মানস্থকিয়ার চাষাভূষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমে বর্জ্জন করে রামপদকে, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদ'র। সমাজের নির্দ্দেশ অমান্য করলে শুধু এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না, তাও জানা কথা। টিটকারী, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুসী অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালোবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার

অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যতা বেরিয়ে আসে। রামপদ'র কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুন কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদ'র বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন কত ঘটছে, ক'দিন সামলাবেন ? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য সহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে !

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে ?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা ? দুগ'গার কথা যদি তোলে কেউ ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত

তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদ'র স্পর্দ্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিঁকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও! আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদ'র কাছে সে হার মানবে! মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা তু'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মতো হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার। গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্ণে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাতুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, তু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদ'র কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও স্নুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা না কি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা! এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে: 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু। বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের

ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁঠো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন ?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাছুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি ? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারি করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছাড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে

না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রঘরের ও এই ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছ, বিড়ি টানে।' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, 'রামপদ'র পেছনে নাকি নেগেছ তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লেলুপতা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতী?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু'-চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভেলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর

নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে সাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এঁ্যা? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্-গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষাভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্‌গম্ করছিল। কি ঔৎসুক্য

ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে—উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে। সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব্ব-পরামর্শ মতো বুড় টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা স্থুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদ'র বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌটাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন মেয়েছেলে গাঁ ছেড়ে ক'দিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ!'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দু'টি খেতে-পরতে দিতে?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে

বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পাড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ-গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মত মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায়নি তো কি? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ী ঝিগিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার?'

প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছু কাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদ'র ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি তবে?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধরে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই?'

বনমালী আশ্চর্য্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-কথা বলে বনমালীকে? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ

দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানস্থকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলার ভুতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানস্থকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? ছাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কী আসতে যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ী বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ী যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অঃ! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিঁকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হত তোর, ক'বছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয় তো—না, গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙ্গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দু'টো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত: মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সঙ্গত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাঙ্গলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে সহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান

জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্ত্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্ম্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্ত্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা বেড়া ক্লাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ও পাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে আদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে ? কে গো ওখানে ?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রোপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্য্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে,

ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙ্গুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি ধুতিখানা বাড়ীর মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্ব্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাক্‌বো মা?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে' শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস্ করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয়না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধূলায় ধূসর হয়ে

যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনকে পোড়া দেহের

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু'বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াই-খানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াই খানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা,বাঁশের দেয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস ছোট বৌ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মস্‌করা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক্ ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাসরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারশী শাড়ী পরা গোকুলের

বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'কুনের ছাউনীর দিকে চলতে থাকে গর্ব্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে ছাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক্, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপত্বরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সাধবা মাগী ?

শন ক্ষেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মস্করা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছুফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চ'ল। ইস্! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকী মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল্ কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙ্গবো ছোট বৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙ্গো—মাথা ভাঙ্গব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে, মেয়েমানুষের কাছে লজ্জা কি ?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বার। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে ?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, 'শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল্ মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল!'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না. জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুরু, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাতুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাতুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাতুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে

চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাহুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে ছ'হাতে মুখ ঢেকে সুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝেয় ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরের ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ হুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করেছ মরণ! খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরণের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সাবু খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।'

সেমিজ না পরলে ছ'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস।

এক-ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দ্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ীর মেয়ারা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ীর মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্‌কা শাড়ীর তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্ত্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো চূণের বস্তা! বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মর্‌ব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্দ্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতের জন সাঙ্গপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশ সেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ী জমে আছে, এসব তথ্য

আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গা মরিপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা'র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি।

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটখাট একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হল ?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল ? কিসের গোলমাল ?'

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। ভাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্ক'র সাঙ্গপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরমর হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারে নি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুণে গুণে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসে নি।'

'কবে আসবে ?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে ?'

হতাশ ম্রিয়মান জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে স্নুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। স্নুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইসারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা ছাখে, ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জ্জন করে লরীটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধূলায় স্বৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোষাক পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে! লালপাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লায় আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড়?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ী সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙ্গে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির সুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে! পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিস্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের

আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত।

'জান্ নয় দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল্?'

ভোলা বলে, 'লুট করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। কদিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা ক'জন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাঁতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁঢরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ী না পাক, কথা সে

আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ী ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। ক'দিন পরে তিনি একখানা শাড়ী অন্তত আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক্, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্তত বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ী পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ী। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার অনেকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নি।'

ঘর থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবেনা বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইঁট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগেও কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা-কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্ব্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্ব্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে

তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে যোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরণের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোন আফশোষ নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে। সেও বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ

নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলেনা। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধা-হাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে সহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি

সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্ত্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফশোষ করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুক্ চুক্! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্য্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

সহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্ব্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক।

সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কাণেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়ীতে রাখবে? শৈলিকে বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায়

কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্য্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কাণে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলো-মেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলর বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের

সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আস্ছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়: তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্য্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের

বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্ত্তমানে সদয়কে শানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ী এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জ্জনে গাড়ী রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে ?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না ? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বস্তি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন সাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত

ধরে। মিনতি করে বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

ছুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যাথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন

সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জ্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ' বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হাল্কা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে

লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গো আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায় ? আর কি মেয়ে নেই পিথিমীতে ?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি ? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল!'

'তুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি ?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক-কাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিষ। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথা ব্যথা, আদর যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন ?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ।

ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

বুড়ী

বুড়ীর বড় পুতি আজ যাবে বিয়ে করতে। ছেলের ছেলে তার ছেলে, বড় সহজ কথা নয়। বুড়ীকে বাদ দিয়েই বাড়ীতে চলেছে আপনজনে-ভরাট বাড়ীর ছেলে বিয়ে করতে গেলে যত কিছু কাণ্ড-কারখানা হয়—রোজ সংসারের সাধারণ হৈ-চৈ-ও যেমন ওকে বাদ দিয়ে চলে। তবু যেন বুড়ী আজও হাজির আছে সব কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে, বাড়ীর প্রতিদিনের সমবেত জীবনযাত্রাতেও যেমন থাকে। তিন কুড়ি বছরের জীবন্ত উপস্থিতির অভ্যস্ত ডালপালা আর শিকড় নিয়ে আছে—বড় ঘরের পশ্চিমের ওই মরা হাজা শুকনো গাছটার মতো, যার ডালে সারাদিন পাখী কিচির-মিচির করে আর নিশুতি রাতে ভাঙ্গাচোরা হাওয়া আওয়াজ তোলে মরমর মরমর।

ন্যাকড়া কাঁথার কাঁড়ি আর পুঁটুলি বালিশ নিয়ে বুড়ী দাওয়ায় বসে থাকে, দাওয়ার চালা নীচু করে নামানো। মরচে-ধরা কোমর, বাঁকা পিঠ, শনের নুড়ি চুল, লোল চামড়া, ফোকলা মুখ, তোবড়ান গাল, ছানিকাটা নিষ্প্রভ চোখ। লাঠি ধরে গুটি গুটি চলতে ফিরতে পারে, শক্তই আছে মনে হয় চামড়া-ঢাকা হাড় আর পাঁজর-ঢাকা ফুসফুস—বেশ জোরে চেঁচাতে পারে। শুয়ে বসেই থাকে বেশী, বিড় বিড় করে আপন মনেই বক বক করে কাটায় বেশীরভাগ সময়। থেকে

থেকে তারস্বরে সংসারের খুঁটিনাটি অব্যবস্থার সমালোচনা করে। পোড়া তামাকপাতাগুঁড়ো খায়। মাঝে মাঝে অকারণে অদ্ভূত আওয়াজে খলখলিয়ে হাসে।

'মরণ!' বলে বৌ আর নাতবৌয়েরা। কেউ জোরে, কেউ নীচু গলায়। নীচু গলায় বলে কচি বৌয়েরা। বুড়ীকে মান্য ক'রে নয়, বুড়ী শুনলেও কানে তোলে না, কানে তুললেও কিছু আসে যায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনে শাশুড়ী-ননদরা পাছে চটে যায়, এই ভয়।

নন্দ বাহারে চুল ছেঁটেছে নিতাই পরামাণিককে দিয়ে। নগদ অটগণ্ডা পয়সা আদায় করেছে নিতাই, তার ছেলে বরের সঙ্গে যাবে, কত কিছু পাবে, তবু। বাড়ীর সাতজন এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতাইকে মন্দ বলেছে। এরকম দিনে-ডাকাতি এদের সয় না।

বুড়ী ডাকে পুতিকে, বলে, 'অ নন্দ, অ ঘাড়-ছাঁটানি ছোঁড়া, শোন, শোন ইদিকে, একটা কথা বলি। বিয়া তো করবি ছোঁড়া, মেয়াটা কুমারী বটে তো?'

নন্দ'র মা শুনতে পেয়ে জা'কে বলে, 'মরণ! কথা শোন বুড়ীর।' তারপর চিন্তিত হয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, 'নয় বা কেন। মেয়া নাকি বড় বাড়ন্ত-ধাড়ী মেয়া।'

'ঘর ভাল।'

'ভাল ঘরে মন্দ বেশী। নয় ধাড়ি করে রাখে মেয়াকে?'

বুড়ীর কাছে উবু হয়ে বসে নন্দ বলে, 'কুমারী না তো কি— তোর মতো বুড়ী?'

'পাবি মোর নাখান কুমারী পিথিমী ঢুঁড়ে?' ফোকলা মুখে

বুড়ী গাল-ভরা হাসি হাসে, 'একরাত্তির শুয়েছি তোর দাত্বর সাথে ? বিয়ের রাতে ভোঁস ভোঁসিয়ে পটল তুলল না তোর দাত্ব ! সে এক কাণ্ড বটে ! ভোঁসভোঁসানি শুনে আমি তো ডরিয়ে গিয়ে কান্না ধরেছি গলা ছেড়ে—হাউ-মাউ ক'রে দোর খুলে বাইরে গিয়ে। বাড়ী শুদ্ধ ছুটে এসে বলছে, কী কী, হয়েছে কী ? আর হবে কী, মোর কপাল ! বুড়োর ততখুণে হয়ে গেছে গা।' বুড়ী খলখলিয়ে হাসে।

পুতি কিন্তু তার হাসে না। পুতির মুখে তার দ্বিধা সংশয় সন্দেহ, অবিশ্বাসের পাতলা মেঘ। খানিক ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে সে বলে, 'তাও হবে বা। মস্ত ধেড়ে মেয়ে, ওকি ঠিক আছে !'

বুড়ী গালে হাত দেয়।—'মর তুই বাঁদর। নিজে না পছন্দ করলি তুই বড় মেয়ে দেখে ?'

'তা তো করলাম—'

'বোকা, হাবা, বজ্জাত ! কুমারী মেয়ে নষ্ট হয় ? আমি নষ্ট হইছি ? বিয়ার রেতে সোয়ামী মোলো, দিন দিন যেন বাড়লো সবার মোকে নষ্ট করার চেষ্টা, নষ্ট হইছি আমি ? কুমারী না হই তো তোর বাপের কিরে ! মেয়া বদ হয় সোয়াদ পেয়ে, কুমারী কি খারাপ হয়রে বেজম্মার পুত ? মরণ তোর !—ষাট, ষাট, ! তুগগা, তুগগা ! তোর বালাই নিয়ে মরি আমি।'

'সত্যি বলছিস ?' পুতি বলে তার মেঘকাটা মুখে আলো ফুটিয়ে।

'না তো কি ?'

কাজ অকাজের ফাঁকে ফাঁকে সবাই ছাখে নন্দ উবু হয়ে বুড়ীর সামনে বসে আছে তো বসেই আছে। কথার যেন শেষ নেই

দু'জনের। থেকে থেকে দু'জনে আবার হেসে উঠছে খলখলিয়ে, হি হি করে।

মেনকা হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, 'আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব? মোর কে আছে?'

নন্দর বৌকে বাড়ীর কারো পছন্দ হয়নি। একে ধাড়ী মেয়ে, তাতে দূর সম্পর্কের মামাবাড়ীতে মানুষ, বিয়েতে পাওনা গণ্ডা জোটেনি ভালরকম, গয়না যা দেবে বলেছিল মেয়ের ধড়িবাজ মামা—তা পর্য্যন্ত সবগুলি মেনকা নিয়ে আসেনি। তার ওপর নন্দ নিজে পছন্দ করে' বাড়ীর লোকের অমতে তাকে বিয়ে করেছে—বিয়ে করে এনে বাড়ীর লোকের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে মাথায় করে রেখেছে বৌকে। বিয়ে সম্পর্কে ছেলের অবাধ্যতার জ্বালা মানুষের জুড়োয় না, মন বিষাক্ত হয়ে থাকে বৌয়ের ওপরেই। রোজগেরে ছেলের ওপর তো গায়ের ঝাল ঝাড়া যায় না!

তার ওপর বিয়ের এক বছরের মধ্যে নন্দ মারা গেল। বর্ষার শেষে পথঘাট উঠানের কাদা যখন শুকোতে আরম্ভ করেছে, বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে নন্দ তখন বৌ নিয়ে দু'মাসের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যাবার জন্য আয়োজন করছে। এ বাড়ীর কোন বৌ কোন কালে একা স্বামীর সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত কোথাও বেড়াতে যায়নি।

এমন অলুক্ষুণে বৌকে কে বাড়ীতে রাখবে?

মেনকার মামাকে লেখা হয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সে জবাবও দেয়নি। রাখালের সঙ্গে তাই তাকে পাঠিয়ে দেবার

আয়োজন হচ্ছে। মামাবাড়ীর দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে রাখাল চলে আসবে, তারপর যা হবে তা বুঝবে মেনকা আর তার মামা।

মেনকা কিন্তু যেতে নারাজ। মামাবাড়ীতে শুধু মারধোর আর ছ্যাঁকা দেওয়ার ভয় থাকলে কথা ছিল না, মামাবাড়ীতে তাকে ঢুকতেই দেবে না সে জানে। দরজা থেকেই তাকে পথে নামতে হবে।

মেনকা তাই হাপুস নয়নে কাঁদে আব বলে, 'আমি কোথা যাব? কার কাছে যাব?'

রোয়াকে বসে বুড়ী ডাকে, 'এই ছুঁড়ি, শোন।'

মেনকা কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কাঁদিস কেন হাপুস চোখে, যোয়ান মদ্দ মাগী?'

'আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে গো।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছে? কে তাড়িয়ে দিচ্ছে? তাড়িয়ে দিলেই তুই যাবি? তোর শ্বশুর ঘর, কে তাড়াবে তোকে?'

মেনকা চুপ করে থাকে।

'মোকে পেরেছিল তাড়াতে? একরাত ঘর করিনি সোয়ামীর, বিয়ের রাতে ছটফটিয়ে মোলো। সবাই বলে, দূর দূর, অলুক্ষুণে বৌ! বিয়ে হল, সোয়ামী খেয়ে কুমারী র'ল, একি মেয়ে গা? দূর! দূর! আমি গেলুম? মাটি কামড়ে রইলাম এখানকার। পারল কেউ তাড়াতে মোকে? অ্যাদ্দিন তুই সোয়ামীর সাথে শুলি, বাড়ীর বৌ হয়ে র'লি, তোকে যেতে বললে তুই যাবি? মাটি কামড়ে থাক। খুঁটি আঁকড়ে থাক।'

মেনকার চোখে আশার আলো দেখা দেয়। সে সামনে উবু হয়ে বসে বুড়ীর।

বাড়ীর সবাই তাকিয়ে ছ্যাখে মেনকা আর বুড়ীর মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস কথা চলেছে তো চলেইছে, কথার যেন শেষ নেই !

গোপাল শাসমল

সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল গিয়েছিল জেলে। একদিন ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরল। জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়ীতে ছিল মণ পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গরু, পুঁই-মাচা লাউ-মাচা আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ী ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গরুটা নেই, পুঁই-মাচায় নেই পুঁই, আর লাউ-মাচায় নেই লাউ। সজনে গাছ তিনটে আছে। সজনে গাছ তিনটির বয়স প্রায় গোপালের সমান। গাছগুলির অনেক ডাঁটা আর আঠা গোপাল খেয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত ডাঁটার চচ্চড়ি এবং ছেলেমানুষ থাকার বয়সটা পার হওয়া পর্য্যন্ত আঠা। আধপেটা ভাত খেয়ে এই ত্রিশ বছর সে জমাট বাঁধা সজনে আঠা সংগ্রহ করে করে চিউয়িং গাম-এর মতো চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল এই কথাটাই ভাবল যে জেল-ফেরত ছেলেকে আধপেটা ভাত দিতে মা উপোস দিয়েছে আর বোনকে না খাইয়ে রেখেছে, এতো ভাল কথা নয়। এর চেয়ে জেলে থাকাই যে ভাল ছিল!

তারপর গাঁ ঘুরে আসতে বেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার সাধ হতে লাগল, পথের ধূলায় কিম্বা কাঁটা বনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে।

বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশী জীবন্ত কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যে-টুকু ছিল তাতেই দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি পূজাপার্ব্বনে উৎসব এমন কি সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ—চোখে হতাশার পর্দ্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভাল ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এত ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনো ছ্যাখেনি। যা'কে ভাল করে ধরেছে তার হাড়ে লাগানো মাংসটুকু পর্য্যন্ত যেন খসে খসে পড়ছে। গফুর আর বনমালীকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল এ বুঝি কুষ্ঠ বা ওই ধরণের কোন ব্যারাম। ভূষণের কাছে সে রোগের নামটা শুনল। ভূষণের হাতে ও পায়ে প্যাঁচড়া হয়েছে।

ভূষণ গোপালের মামা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আরও বুড়ো দেখায়। একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, জোতদার কানায়ের কাছে বিশ বাইশ বছর কাজ করার অবসরে সব আবার ভুলে গেছে।

'কাজ? না, কাজ নেই। অসুখে ভুগলাম দু'মাস, তারপর হাতে পায়ে হল এই প্যাঁচড়া। ভাগিয়ে দিয়েছে।'

আজ শুধু বুড়ো নয়, ভূষণকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দু'হাতের থাবা উঁচু ক'রে তার বসার ভঙ্গিটা পাছা-পেতে-বসা বুড়ো ভালুকের মত। থ্যাবড়া মুখটা এমন

লম্বাটে হয়ে গেছে, দু'পাশ থেকে যেন পিষে দিয়েছে কোন জোরালো পেষণ যন্ত্র।

'নগা কিছু করছে না ?'

'ঘানি টানছে। তুই যা অ্যাদ্দিন করে এলি। আমায় ছাড়িয়ে দেওয়ায় কানায়ের ওপর চটে ছিল। সীতু, রাখাল, বঙ্কি আর কটা ছোঁড়াকে নিয়ে কেনালে কানায়ের চালের নৌকো ধরিয়ে দিতে গেছল বাহাদুরী করে। ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জ্জে জেলে গেছে। ব্যাটা কুপুত্র চণ্ডাল! দু'বেলা খেতে পাবার মতলব ছিল ব্যাটার।'

ভূষণের মেয়ে রতন এসেছিল একখানা তাঁতের কাপড় পরে।

'কি যাতা বলছ বাবা। দাদা গেল তোমার জন্যে শোধ নিতে, তুমি বলছ তার মতলব ছিল। খেতে পাবার জন্যে কেউ জেলে যায় ?'

বলে সে হাঁটু-বাঁকাবার যন্ত্রণায় মুখ বাঁকিয়ে গোপালের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।

গোপাল এসে মামাকে প্রণাম করেনি। যাবার সময় ভূষণের পায়ের পাতার আধ হাত তফাতে মাটি ছুঁয়ে সে প্রণাম সারল।

পথে নেমে জোতদার কানায়ের বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল ভাবে, পৃথিবীতে যা সব ঘটছে তা তার বোধগম্য হবে না। বিশ বছরের বেশী যে কাজ করে এসেছে সে দু'মাস অসুখে ভুগে অশক্ত হয়ে পড়ায় কানাই তাকে ভাগিয়ে দিল! কেবল তাও তো নয়। দু'এক যোজন দূরের হোক, কানায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্কও যে আছে তার ভূষণ মামার। যে সম্পর্কের জোরে তারও অধিকার আছে কানাইকে বড় মামা বলার।

জোতদার কানায়ের বাড়ীর কাছে এসে কান্নার আওয়াজ শুনে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাঁয়ে পা দেবার পর এই কান্নার শব্দে যেন তার নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার আবেষ্টনী ভেঙ্গে পড়ল এতক্ষণে, বেলা যখন খতম হয়ে এসেছে। এখন তার খেয়াল হল, গাঁয়ের এতগুলি নারীপুরুষের বুকভরা শোক কান্নায় রূপ পায়নি, কান্না সে শোনেনি গাঁয়ে এসে। মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে এতক্ষণ সে অনুভব করেছে কিন্তু কতগুলি জীবন্ত কঙ্কাল চোখে পড়ায় সে অনু-ভূতিকে বুঝতে পারেনি। অথচ এ অনুভূতি তার কত চেনা! কতবার জনহীন শ্মশানে তার হৃদয় মন এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে।

দাওয়ায় বসে কানাই আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে অদৃষ্টকে শাপ দিচ্ছিল! গোপাল প্রণাম না করায় চটে গেলেও শ্রোতা পাওয়ায় সে খুসী হল। তার ছেলের আজ ফিট হয়েছে। দু'বছরে তেরো হাজার টাকা উপায় করেছে এমন সোনার চাঁদ ছেলে। কোন বিশেষ অপদেবতা বা অপদেবী নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন এই নজর দেওয়া, এত ধম্মো কম্মো পূজা অর্চ্চনা করার পর!

'দু'বচ্ছর চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাবার জন্যে হবে বা? শশী একটু ভয় কাতুরে বটে তো।'

'কিসের ভয় ভাবনা?' সবিস্ময়ে কানাই শুধোয়।

'এই ধরা টরা পড়ে' জেলে যাবার ভয়। চোরাই কারবারে ভয় তো আছে।'

'কচু আছে। হাজার হাজার লোক করেছে না ও কারবার? তুই বাঁদর, জেল খাটিস। ওর জেলের ভয়টা কিসের?' থেমে গিয়ে কানাই থুতনিটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ নাড়ে আর লোমবহুল বুকে বাঁ হাতের তালু ঘষে—অম্বলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকটা।

'সুধাময়ী এসেছে আজ।'

'বটে নাকি? বেশ।'

'এয়েছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল, বজ্জাতের ধাড়ী।'

গোপাল খবরটা শুনেছিল। কানাইয়ের মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছিল গত বছর আশ্বিন মাসে। এবছর কার্ত্তিকের গোড়ায় সে প্রসব হতে এসেছে বাপের বাড়ী। জামাই এসে রেখে গেছে।

হুঁকো এসেছিল। কানাই হুঁকো টেনে কাসে আর বলে, 'পেটে তিনবার নাথি মেরেছে। নক্তে ভেসে যাচ্ছে পিঁথীমী। তয়ই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাকতার কবরেজ, টাকা খসাবো মুঠো মুঠো—মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপকে? মরণ সংবাদ দিলেই হত একবারে!'

'ডাক্তার এনেছেন কাকে!'

'মধুকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। ওর গাছগাছড়া অব্যথ্য। ভীমের মাকেও আনেয়েছি। ও বড় ভাল দাই। একাজ করে করে চুল পেকে গেছে।'

গোপাল শোনে আর ভাবে, কানায়ের বাড়ী কেন এসেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ উঠে সে বিদায় নেয়।

কানায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে জীবনে প্রথম বিজের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে গোপাল নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভূষণের বাড়ীর কাছে পৌঁছন পর্য্যন্ত। সুধার রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। ভীমের সত্তর বছরের বুড়ী মা, যে কানে কম শোনে, চোখে কম ছ্যাখে, সে সুধাময়ীকে মারছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে তার কেটে কেটে বসে গিয়েছে অথচ দুঃখ-বেদনার বদলে সে অনুভব করছে সন্তোষ! যা হওয়া উচিত এ যেন তাই হয়েছে! নিয়ম রক্ষা—নীতির সম্মান বজায় থেকেছে। কানাই কষ্ট পাক, তাতে পরম তৃপ্তি বোধ হোক, ততখানি হিংসুটে ছোটলোক হতে জেলখাটা গোপালের আপত্তি নেই। কিন্তু কানাইকে শাস্তি দেবার জন্য সুধাময়ীর রক্তে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অমানুষ হওয়া কি তার উচিত?

গাঁয়ের অনেকের বাড়ী ঘুরেও, কার' ক'জন আপনজন না খেয়ে মরেছে শুনেও, ভূষণমামার সঙ্গে আলাপ করে সুধাময়ীর জন্য ব্যথা বোধের অক্ষমতায় গোপাল কাবু হয়ে রইল। ভূষণের বাড়ীর কাছে যখন সে পৌঁছল, সন্ধ্যা উৎরে গেছে। চাঁদ বুঝি উঠবে মাঝ রাতের কাছাকাছি, আকাশের কুয়াশায় তারাগুলি ম্লান, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ভূষণের মেয়ে রতন সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে এসে গোপালের হাত ধরল।

'চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—'হুস করে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল।

'কে ? কে তুমি ?' প্রশ্ন না করেই রতন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আবার গোপাল টের পেল পথ নির্জ্জন। সন্ধ্যার খানিক পরেই এত বড় গাঁয়ের মৃত জনহীনতায় একা সে জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দায়িক হয়ে। সুধাময়ীর কথা সে ভুলে গেল। রতনকে সে বড় স্নেহ করত।

মঙ্গলা

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডোবা থেকে উঠে আসে। পুলিশ হঠাৎ গাঁয়ে হানা দিয়েছিল মাঝরাতে। সেই থেকে এই সকাল পর্য্যন্ত সে ডোবার জলকাদায় আগাছার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছে।

হাঙ্গামার পর থেকে এই নিয়ে পুলিশ সাতবার হানা দিল গাঁয়ে। আবার যদি হানা দেয় কিছুকাল পরে, শীত যখন আরও বেড়ে যাবে, এতক্ষণ ডোবায় এভাবে লুকিয়ে থাকতে হলে ডোবার মধ্যেই সে জমে কাঠ হয়ে যাবে নিশ্চয়, উঠে আর আসতে হবে না। অঘ্রাণের শেষেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে, পোষ মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ!

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দিশেহারা হয়ে ছুটে ডোবায় নামবার সময় বাঁ পায়ের তলাটা কিসে যেন কেটে গিয়েছিল অনেকটা, ভাঙ্গা কাঁচে না শামুকগুগলিতে কে জানে। কত রক্ত যে বেরিয়ে গেছে দেহ থেকে ঠিকানা নেই। আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি বহুক্ষণ, চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়েছে সে বেশ টের পেয়েছে। আঁচলটা কি লাল হয়েছে দ্যাখো।

সকাল বেলার রোদের মৃদু তেজে মঙ্গলার অসাড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে সাড়া আসে, ঘন ঘন কেঁপে কেঁপে সে শিউরে ওঠে। হঠাৎ

সে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। প্রায় জমে যাওয়া অনুভূতিগুলিও যেন তার সূর্য্যের তাপে এতক্ষণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি শীতের কাঁপুনি কমাতে কানাই এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়েছিল। দু'হাতে ছিলিমটা পাকিয়ে ধরে সাঁ সাঁ করে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আধবোজা গলায় সে বলে, 'কাঁদিস নি মঙ্গলা। পরের বার ভাগব নি আর। ঘরে থাকব। যা করার করবে।'

পাছা টন টন করে ওঠে মঙ্গলার। পাছায় সে বেত খেয়েছিল দু'মাস আগে, সে ব্যথা আজও থাকার কথা নয়। তবে উলঙ্গ করে বেত মারা হয়েছিল বলে বোধ হয় ঘটনার সঙ্গে শারীরিক বেদনাটাও তাজা কটকটে হয়ে আছে স্মৃতিতে।

কানাই-এর ছোট ভাই বলাই ডোবায় না গিয়ে উঠেছিল বাড়ীর দক্ষিণে তেঁতুল গাছটায়। ওদের মতো জলকাদায় ভিজে শীতে কষ্ট না পেলেও সমস্ত শরীরটা তার ব্যথায় টনটন করছে। কলকেটা নিয়ে দাদার দিকে পিছন ফিরে বসে টান দিয়ে সে বলে, 'মোদের আর কিছু করবে না মন করে। ফেরার কজনার জন্যে তো হানা দিচ্ছে, মোদের মারধোর আর না করতে পারে।'

'বলেছে তোমার কানে কানে, পীরিতের সাঙ্গাৎ তুমি।'

মঙ্গলা গর্জ্জে ওঠে। সেই সঙ্গে তারস্বরে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগতে যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের চোদ্দপুরুষকে।

বাড়ীর সামনে পথ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি শুনতে পায় অধর

ঘোষাল। হনহনিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে মুখে হাত চাপা দেওয়ার মতো ব্যস্ত বিহ্বল মানায় তাকে থামিয়ে দেয়।

'থাম ছুঁড়ি, থাম। কে গিয়ে খবর দেবে, মরবি যে তখন?'

'ঠিক্। সবার হাঁড়ির খবর যাচ্ছে, অবাক কাণ্ড।'

'ভূষণ শালা একজন, ওবাড়ীর ভূষণ মাইতি।'

অধর ব্যাকুলভাবে ধমকে বলে, 'থাক্ না বাবা, থাক না। অত দিয়ে কাজ কি তোদের, চুপ মেরে থাক না?'

'চুপ মেরেই তো আছি গো বাবু। বোবা বনে গেলোম।' বলে মঙ্গলা এতক্ষণে পিঁড়ি এনে অধর ঘোষালকে বসতে দেয়।

'না, আর বসব না।' বলে অধর ঘোষাল উবু হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

অধর রোগা, ঢ্যাঙ্গা, চিকণ শ্যামবর্ণ। চুলে সবে পাক ধরেছে কিন্তু ভুরু একেবারে সাদা। শীর্ণতা, লম্বা গলাবন্ধ কোট আর পাকা ভুরুর জন্য তাকে ভারি হিসেবী, বিষয়ী ও বিবেচক মনে হয়।

'বলতে তো ভরসা হয় না তোদের, পেটে কথা রাখতে পারিস নে। বলে বেড়াবি দশজনকে।'

কিছু বলতে চায় বুড়ো। পেটে কথা চেপে রাখতে পারছে না। তাই এমন মুখের ভঙ্গি করেছে যেন তাদের অবিশ্বাস করেও অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করছে। অধরের কথা আর ভঙ্গিতে গা জ্বলে যায় মঙ্গলার।

'সুদেব আর ভূদেব কাল রাতে এয়েছিল। মরমর মা'টাকে দেখতে।'

'বটে ?' কানাই আর বলাই-এর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

'সাহস কী, মাগো! গাঁয়ে এল ?' মঙ্গলা বলে।

'খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল।'

'ধরেছে নাকি ?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে তিনজনে।

অধর মাথা নাড়ে।—'না। পালিয়ে গেল। কী করে পালাল ভগবান জানে, চাদ্দিকে ঘিরে ফেলেছিল।' অধরের চোখ প্রায় বুজে আসে, মৃদু ক্ষোভ আর আপশোষের সুরে বলে, 'পুলিশ এবার বলবে, গাঁয়ের লোক ওদের লুকিয়ে রাখছে, সাহায্য করছে। ফের তল্লাসী চলবে নতুন করে, জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হবে, চষে ফেলবে গাঁটাকে। ছাখ দিকি বাপু, তোদের কজনার জন্যে গাঁ শুদ্ধ লোকের কি দুর্ভোগ ? নিজের মা বোন বাপ ভায়ের কথাটাও ভাববিনে তোরা ?'

মঙ্গলা থতমত খেয়ে যায়। কথাটা তো ঠিক বলেছে হাড়হাবাতে বজ্জাত বুড়ো!

বজ্জাত ? আজ প্রথম মঙ্গলার খেয়াল হয় গাঁয়ের প্রায় সব লোক কতকাল অধরকে মনে মনে বজ্জাত বলে জেনে রেখেছে তার হিসেব হয় না, অথচ ওর কোন বজ্জাতির খবর তো তারা রাখে না! সে নিজেও মনেমনে লোকটাকে কত খারাপ বলে জেনে এসেছে চিরকাল, অথচ চিরদিন সাধু, ভদ্র, পরোপকারী বিবেচক মানুষ যেন সে এমনি ব্যবহারই করে এসেছে তার সঙ্গে। ও কেন খারাপ, কোন বিষয়ে অসাধু, অভদ্র, অনিষ্টকারী বা অবিবেচক তাতো সে কিছুই জানে না।

কিছুদিন থেকে একটু বেশী যাতায়াত আর ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করায় মনে হয়েছিল, বুড়ো বুঝি মজেছে। বয়স কাঁচা না থাক, যৌবন যা

আছে তাতেই বুড়োকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারবে ভেবেছিল সে। কিন্তু এক ঘাটের জল খেতে চাওয়ার সাধও তো শেষ পর্য্যন্ত বুড়োর দেখা যায় নি!

'কতকাল পালিয়ে বেড়াতে পারবি বল?' খানিক থেমে থেকে, একটু প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে, অধর বলে, 'ধরা পড়বি, দুদিন আগে আর পরে। নিজেরাই ধরা দে, হাঙ্গামা চুকুক, আমরা বাঁচি। গাঁয়ে বা আসবার কী দরকার ছিল তোদের দু'জনের? পালিয়েছিস, দূরে পালা, পুলিশ জানুক গাঁয়ের ধারে কাছে তোরা নেই। মাকে দেখতে এয়েছে! কত দরদ মায়ের জন্যে! বুড়ো বাপ থেঁতুনি খাচ্ছে, মায়ের চিকিচ্ছে নেই, ধরা না দিয়ে দরদ করে দেখতে এলেন মাকে। খুব তো দেখলি, গাঁ শুদ্ধু লোককে হাঙ্গামায় ফেলে গেলি ফের!'

আরেকটু বেলা করে অধর উঠল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমার গরুটা খুঁজে দিস, কানাই বলাই। কাল থেকে পাত্তা নেই। খোঁয়াড়ে যদি ফের দিয়ে থাকে যদু দত্ত, দেখে নেব এক চোট যদুকে আমি, এই বলে গেলাম তোদের।'

আরও বেলায় মঙ্গলা বড় পুকুরে নাইতে যায়। গা-গতর জমে থাক, ব্যথা হোক, ভেঙ্গে আসুক, নাইতে হবে, রাঁধতে হবে, পোড়া পেট শুনবে না। দত্তদের বড় পুকুরের ঘাটে মেয়ে পুরুষ নাইতে আর জল নিতে এসেছে, এ ঘাটে বাসন মাজা বারণ। ফিসফাস গুজগাজ চলে গত রাত্রের ব্যাপারের। অধর গোপন কথা কিছু ফাঁস করেনি, সবাই জানে সব কথা। বরং ঘটনা কিছু বেশীই জানে অধরের চেয়ে। কেবল সুদেব

আর ভূদেব নয়, ফেরারীদের আরেকজনও নাকি গাঁয়ে এসেছিল কাল রাত্রে। কে সে ঠিকমত জানা যায় নি। কেউ বলে দীনু বসাকের ছেলে তিনকড়ি, কেউ বলে সতীশ সামন্তের ভাই যতীশ সামন্ত, কেউ বলে পদ্মলোচন সাউ নিজে। মঙ্গলার হঠাৎ খেয়াল হল অধরের কথার আসল মানেটা। না, তাদের পেটে কথা থাকে না বলে ব্যাপারটা তাদের শোনাতে ভাবনা হয়নি অধরের, ব্যাপারটার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আর পলাতকদের যে সমালোচনা সে শুনিয়েছে তাই ছিল তার গোপন কথা। কে জানে গাঁয়ের মানুষ দুর্ভোগ চায়, না, ফেরারীরা ধরা দিয়ে তাদের একটু স্বস্তি দিক, এটা চায়! সে দিনকাল আর নেই, ঘা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে শান্তশিষ্ট অলস নির্জীব মানুষগুলি। ওদের মন বোঝা ভার!

তবে, কিছুই না করে, বাড়ী বাড়ী অন্তত খানাতল্লাস আর সকলকে জেরা পর্য্যন্ত না করে, ভোর ভোর পুলিশ গাঁ ছেড়ে চলে গেল কেন ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেছে। মঙ্গলাও এই কথাটাই ভাবছিল।

কালু দাসের কচি বৌটা, স্বামী যার এখনো আটক আছে, জলে কলসী আর পা ডুবিয়ে বসে চুপ করে সকলের কথা শুনছিল, মাথাটা একটু হেঁট করে একদৃষ্টে কালচে জলের নীচে খেলায় রত দত্তদের পোষা বড় বড় লালচে রুই কটার দিকে চেয়ে। মঙ্গলা কলসী কাঁখে তুলে উঠছে, সে হঠাৎ বলে, 'যাবে নি? একবার ওনারা এয়েছেন, ফের তে আসতে পারেন, তাই চলে গেছে। ফের ওনারা এলে, তখন ধরবে।'

শুনে কেউ অবাক হয় না, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না। পুলিশ কেন

কী করে জানা যেন চাষীর ঘরের এতটুকু কচি বৌয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীর দিকে চলতে চলতে মঙ্গলা ভাবে, তা বটে, ওরা আসতে পারে আবার। সুদেব আর ভূদেবের আসবার সম্ভাবনাই বেশী, মায়ের ওদের আজ-মরে কাল-মরে অবস্থা, অন্যেরাও আসতে পারে, তাদেরও মা বোন ভাই আছে।

গোলোক যদি আসে? ওর অবশ্য তেমন আপন কেউ কেউ নেই এখানে। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা ধরলে আছে, না ধরলে নেই। তবু, কিছুদিন তো ছিল তার কাছে লোকটা, আর ছিল বলেই ওর জন্য ভোগান্তি তার কম হয়নি এবং হচ্ছে না, খবর নিতে কি আসতে পারে না একবার?

যদি আসে, একচোট ওকে নেবে মঙ্গলা। পাছাটা টনটন করে ওঠে মঙ্গলার, কোমরটা একটু বেঁকে গিয়ে কলসীর জল খানিকটা উছলে পড়ে যায়। ইস, কী হয়ে গেছে দেহটা তার, এক কলসী জল বইতে এত কষ্ট! জেল হোক, দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক, গোলকের নাগাল পেলে মঙ্গলা তাকে ধরা দিতে বলবে। নিজে ধরা না দিলে, সেই তাকে ধরিয়ে দেবে। কেন, কিসের অত খাতির ওর।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে মঙ্গলার। পায়ের কাছে ঘাসে কলসীটা নামিয়ে রেখে চারিপাশের জগতকে প্রাণভরে গলা ফাটিয়ে একচোট গালাগালি দিতে মনটা তার ছটফট করে। মাঠ জঙ্গল নালা ডোবাকে, আস্ত আর পোড়া চালার ভস্মগুলিকে, ফসল ভরা আর ফসল-পোড়া ক্ষেতগুলিকে, অঘ্রাণের সোনার সকালকে, চলমান মানুষ আর গরু বাছুরগুলিকে। মাটিতে পায়ের পাতায় কাটার ব্যথা ভুলে

গিয়ে লাথি মারে মঙ্গলা মোটে একবার। গোলকের কাছে সে সতীত্ব দিতে পারত খুসী মনে আর গোলকের জন্য তার সতীত্ব গেল আস্তাকুঁড়ে, লাঞ্ছনা হল অকথ্য। পা দিয়ে আবার রক্ত বেরোলি, ছাখো ! তার খবর নিতে কেন আসবে গোলোক !

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে বাড়ী গিয়ে মঙ্গলা তুটি ভাত সিদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। পা-টা তার একটু একটু করে ফুলতে থাকে সারাদিন, সন্ধ্যার সময় ফুলে ঢোল হয়ে যায়। রাত্রে আরও ফুলবে সন্দেহ থাকে না। পলাশ পাতা পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দাওয়ায় শুয়ে মঙ্গলা কাতরায়। জ্বরের ঘোরে তার কেমন নেশার মতো আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, মনে তার দেহের জ্বালা মন্ত্রণার অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়েছে। কানাই গেছে অধরের হারানো গরুটা ফিরিয়ে দিতে, বেগুণ ক্ষেতে ঢোকায় দত্তরা সত্যই নাচালের খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল—আড়াই ক্রোশ পথ। বলাই গেছে বসন্ত কবিরাজের বাড়ী, মঙ্গলার জন্য ওষুধ আনতে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা লোক সোজা উঠান পেরিয়ে দাওয়া ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেও মঙ্গলা ভয় পায় না।

ঝিমানো সুরে শুধোয়, 'কে ? কে গো ?'

গোলোক বলে, 'আমি গো, তুমাদের দেখতে এলাম।'

'সাঁঝ সকালে জানান দিয়ে দেখতে এলে ? ধরবে যে ?'

'ধরে ধরবে। ধরা দিতেই তো এইছি।'

'ধরা দিতে এয়েছো ? অ!'

'সবাই এইছি ধরা দিতে। পরামর্শ করে এইছি। গাঁয়ের সবাই

মোদের বেঁধে ধরিয়ে দেবে—মোরাই বলব ধরিয়ে দিতে, জরিমানাটাও যদি মাপ হয় গাঁয়ের। ইস্, এ যে অনেক জ্বর গো!'

গোলাকের ঠাণ্ডা হাত গা থেকে সরিয়ে মঙ্গলা কপালে রাখে।

'গাঁয়ের লোক ধরিয়ে দেবে? দিচ্ছে—পায়ে ধরে সাধো গা। খানিক খানিক খপর কি পায়নি হেথা কেউ, তোমরা কোথায় আছ, কী করছ? মুখ খুলেছে কেউ? নাগসায়রে তুমি যেতে পারো, একথাটি বলতে পারতাম না আমি? বলেছি? দাঁতে দাঁত কামড়ে থেকেছি আগাগোড়া।' মঙ্গলা একটু ঝিমায়। 'ধরা দিতে এয়েছো। এঁ্যা? নাই বা দিলে ধরা? যাক না কিছুকাল। দেখা যাক না কী হয়।'

'নাঃ। মোদের জন্যে গাঁ শুদ্ধ, লোক ভুগবে? আজ রাতটা যে যার বাড়ী কাটাব, সকালে দত্তদের ওখানে সবাইকে ডাকিয়ে বলব, মোদের আটক করে খপর পাঠাও।'

মঙ্গলা জ্বরের ঘোরে হাসে। 'সবাইকে ডাকিয়ে বললে খপর যাবে না। সবাই মিলে বরং বলবে, পালাও শীগগির। খপর দেবার যে আছে দু'একজন, তারাই খপর পৌঁছে দেবে ঠিক।'

বলতে বলতে কানাই বলাই এসে গোলককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

গোলোক বলে, 'ভয় নেই, খপর নিতে এইছি।'

বলাই ঢোক গিলে মঙ্গলাকে বলে, 'কবরেজ মশায় মালিশ দিলে একটা। আর বললে সেঁক দিতে।'

একথার জবাব না দিয়ে মঙ্গলা কানাইকে শুধোয়, 'বুড়ো ঘরে ছিল?'

'ছিল।'

তখন মঙ্গলা উঠে বসে। বলাই আর গোলককে বলে, 'তোমরা বসে থাকো, এখুনি আসছি।'

কষ্টে দাওয়া থেকে পা নামিয়ে বলাই-এর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'ধরে নিয়ে চল দিকি ভাই আমাকে একটু। চটপট চল। থামো বাবু তোমরা, ফপরদালালি কোরো না, যা বলছি শোন।'

বলাই-এর ঘাড়ে ভর দিয়ে ফোলা পা-টা টেনে টেনে মঙ্গলা বাইরের কুয়াশায় বেরিয়ে যায়।

কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়ায় ভারি হয়েছে।

'কোথা যাবে?'

'চল্ না দাদা।' মঙ্গলা কাতরে ওঠে।

অধরের বাড়ী পৌঁছে মঙ্গলা ভেতরে যায় না, বাড়ীর সামনে কদম গাছটার তলে দাঁড়িয়ে থাকে। বলাই ডেকে আনে অধরকে।

'শোনেন। খপর আছে।'

লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের চেহারা দেখে অধরের সাদা ভুরু কুঁচকে যায়। সেই লণ্ঠনের আলোতেই মঙ্গলা অধরের সদরের ঘরের জানালায় দেখতে পায় ভূষণ মাইতির মুখ।

'ওরা আজ গাঁয়ে আসছে, ধরা দিতে। সব ক'জনা আসছে।'

'ধরা দিতে আসছে?'

'হাঁ, সব ক'জনা। গোলোক এসেছিল, মোকে বলে গেল।'

'অ, তা গোলোক চলে গেছে নাকি?'

'আসবে ফের। মোর কাছে থাকবে। বললে কি, আজ রাতটা

যে যার ঘরে থাকবে আপনজনের সাথে, কাল সকালে ধরা দেবে। রাতে যদি খবর পেয়ে পুলিশ আসে, তবে নাকি ফের পালাবে, আর আসবেনি ধরা দিতে কোনকালে। বলে কি জানেন, গাঁয়ের লোকের মুখ চেয়ে ধরা দেবো বলে আসছি, একটা রাত যদি না ঘরে থাকতে দেয় তারা, তবে কাজ কি মোদের ধরা দিয়ে! মোর ডর লাগছে গো বাবু। কালকের মতো যদি পুলিশ আসে তো সব্বোনাশ। ওরাও ধরা দেবেনি, মোদেরও মরণ!'

কথাটা বিবেচনা করতে করতে ধীর শান্তভাবে অধর বলে, 'পুলিশ কি খপর পাবে?'

মঙ্গলা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, 'যদি পায়? কী হবে তবে? একজনাও ধরা পড়বেনি জানেন তো, গাঁয়ের আধকোশের মধ্যে পুলিশ এলে গাঁয়ে জানা-জানি হয়ে যায়। কালের মতো পুলিশ আসবে, এসে দেখবে সবাই পালিয়েছে। কী উপায় হবে?'

অধর চোখ বুজে বলে, 'ভগবান যা করেন। আমরা কী করতে পারি বল? তবে কি জানিস, কাল এসেছিল, আজ আবার পুলিশ আসবে মনে হয় না।'

বাড়ী ফিরে মঙ্গলা শুয়ে পড়ে ধপাস করে।

বলে, 'আলোটা জ্বাল বলাই, যেটুক তেল আছে জ্বেলেদে; দু'ভাই মিলে রাঁধাবাড়া কর কি আছে ঘরে, একটা লোক এয়েছে, থাকবে একটা রাত, খেতে দিতে হবে না তাকে? আর তুমি একটু মালিশ কর পায়ে।'

নেশা

পুলকেশের সিনেমা দেখার নশা একেবারে ছিল না। যতীনেরও তাই। সত্যিকারের কোন ভাল ছবির খবর পেলে, রুচি, রসবোধ আর বিচারশক্তি আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এমন কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে খবর পেলে হয়তো কখনো নিজেরা শখ করে গিয়ে দেখে আসত ছবিটা। তাছাড়া ইচ্ছে করে কখনোই তারা সিনেমায় যেত না। মাঝে মাঝে তবু যে যেতে হত তার কারণ ছিল ভিন্ন। সিনেমা যাবার ভীষণ শখ আছে অথচ কউ না নিয়ে গেলে যেতে পারে না এমন যার বা যাদের আব্দার এড়ানো চলে না, তাকে বা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হত।

ছায়াছবি যে একেবারে তারা হুবহু উপভোগ করে না তা নয়। একটু উল্টোভাবে কিছু কিছু উপভোগ করে—দর্শকের যেরকম উপভোগের জন্য ছবিটা মোটেই তৈরী হয়নি। বাংলা আর হিন্দি ছবি হলেই পুলকেশ আর যতীনের অভিনব উপভোগটা জমে বেশী। উদ্ভট অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে কাহিনী, চরিত্রগুলির অমানুষিক খাপছাড়া আর সঙ্গতিহীন কথাবার্ত্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, যেখানে সেখানে গান, উৎকট হাসি কান্না আর ভাঁড়ামি ইত্যাদি তাদের হাসির অনেক খোরাক জোটায়। অন্য সকলের তন্ময়তার মর্য্যাদা রাখার জন্য যেখানে সশব্দে হাসা সম্ভব হয় না সেখানে মুখে রুমাল গুঁজে হাসিটা চাপা

দেয়। সময়টা তাই একরকম তাদের কেটে যায় হাই না তুলে, ঘুম না পেয়ে।

মৃণ্ময়ী একদিন আশ্চর্য্য হয়ে পুলকেশকে বলেছিল, 'তুমি কেঁদে ফেল্লে! দৃশ্যটা খুব করুণ সত্যি, কিন্তু—'

'কোন দৃশ্যটা?'

'মেয়েটা যেখানে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে—'

'ও দৃশ্যটা করুণ নাকি? আমার তো ভারি কমিক লাগছিল। এত কাণ্ডের পর অচেনা বাপের সংগে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন মানে হয়? আমরা নয় জানি ও লোকটা মেয়েটার বাপ। কিন্তু মেয়েটাও কি তা জানে? আমি তো ভাবছিলাম মেয়েটা যাতে বাড়ীতেই থাকে তার জন্য প্লট এত ঘোরালো করা হচ্ছে!'

মৃণ্ময়ী আহত হয়ে বলে, 'ও, তুমি কাঁদো নি? হাসি চাপছিলে!'

দেহমনে স্বাস্থ্য, জীবনে আনন্দ, অসঙ্গতির হাস্যকর দিকটাই চোখে পড়ে আগে। তাই, জীবনের সংগে ছবিগুলির সংযোগের অভাব দেখে, কষ্টকল্পনা দেখে, সস্তা ও হাল্কা রোমান্সের গেঁজলা রস থই থই করতে দেখে, এমন কি মানুষের মনে ছবিগুলির প্রভাব যে কিছু কিছু ক্ষতিকর তা ভেবেও, পুলকেশরাও বিদ্বেশমূলক সমালোচনার ঝাঁঝ অনুভব করে না। এই সব ছবি দেখার জন্য যারা পাগল তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করে না। কেবল এই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে ছেলেভুলানো এ জিনিষ দিয়ে বয়স্ক মানুষ নিজেকে ভোলায় কী করে! নিজেদের ভোলাবার এত জিনিষ

রয়েছে জগতে! এরকম আশ্চর্য্য হওয়ার মধ্যে নিজেদের বেশ বস্তু-তান্ত্রিক ভাবপ্রবণতাহীন মনে হয় বলে খুব তারা গর্ব্ব অনুভব করে!

তারপর জীবন আসে পরবর্ত্তী বাস্তব অধ্যায়ের নিয়ম, অনিয়ম, প্রয়োজন আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূচনা নিয়ে। যেভাবে আরম্ভ করবে ভেবেছিল, পুলকেশ বা যতীন কারো আরম্ভটাই সেরকম হয় না। হাসিমুখেই তারা সেই আরম্ভকে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন হওয়ায় বৈচিত্র্যময় প্রেমের লীলাখেলায় কত সময় যে তার কোথা দিয়ে কেটে যায়!

শেষের তিন বছর একবারও পুলকেশ কোন সিনেমায় যায়নি। এই নিয়েই একদিন মৃণ্ময়ীর সঙ্গে তার দারুণ কলহ হয়ে গেল। সিনেমায় মৃণ্ময়ী হরদম যায়, অন্যের সঙ্গে। কিন্তু কেন তা হবে? কেন তাকে পুলকেশ একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে পারবে না? কোন স্বামী এ রকম ব্যবহার করে স্ত্রীর সঙ্গে? তার নিজের যেতে ভাল না লাগুক, মৃণ্ময়ীর কি সখ থাকতে নেই।

'আরেকদিন নিয়ে যাব।'

'আরেকদিন কেন? আজ নিয়ে চল।'

তাই করতে হল শেষ পর্য্যন্ত। বহুদিন পরে পুলকেশ সেদিন একটি বাংলা ছবি দেখল। খাপছাড়া অদ্ভুত মনে হল বটে ছবিটা, কিন্তু আজ আর হাস্যকর মনে হল না। এমন কি অজানা নতুন তরুণ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পা দেওয়া মাত্র কম্পাউণ্ডারের বয়স্থা কুমারী মেয়েকে তার সঙ্গে মাঠে গিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে লাফাতে লাফাতে ডুয়েট

গান করতে দেখেও তার হাসি পেল না, বরং বেশ মিষ্টি আর রসালই লাগলো ব্যাপারটা।

মসগুল হয়েই পুলকেশ শেষ পর্য্যন্ত ছবিটা দেখে ও শুনে গেল।

পরের শনিবার অফিসের এক সহকর্ম্মীর সঙ্গে সে আবার সিনেমায় গেল। পরের সপ্তাহে গেল তিনবার। কয়েকমাসের মধ্যে সে নিয়মিত ভাবে সিনেমায় যেতে এবং ভালমন্দ নির্ব্বিচারে ছবিগুলি তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি আর তারকাদের বিষয় আলোচনা ও তর্ক করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদিন ম্যাটিনিতে নাচে গানে প্রেমে বিচ্ছেদ আর শেষ মিনিটের মিলনে জমকালো এক ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সঙ্গে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, যতীন ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটছিল ফুটপাতে। যতীনকে হঠাৎ দেখে পুলাকশ চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। তার শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধময়লা জামাকাপড়। যতীন নিজেই তাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

এতদিন পরে দেখা, কিন্তু এমনি নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে দু'জন যে উল্লাসটা তেমন জোরালো হল না। কিছুটা আশ্চর্য্য আর কিছুটা খুশী হয়ে পুলকেশ বলল, 'যতীন! কলকাতা এলি কবে?'

যতীন বলল, 'মাসখানেক। তোর বাড়ী যাব যাব ভাবছিলাম, হয়ে ওঠেনি।'

যতীনের মুখে পুলকেশ মদের গন্ধ পায়। চোখে দেখতে পায় নেশার আবেশ। কথায় একটা অস্বাভাবিক টলোমলো প্রফুল্লতা।

দুই বন্ধু কথা বলে ধীরেসুস্থে, খবর নেয় আর দেয় ছাড়া ছাড়া ভাবে এতগুলি বছর ধরে অজস্র কথা জমেছে কিন্তু বলার বা শোনার তাড়া যেন তাদের নেই।

যতীন বলে, 'আয়, বসে কথাবার্ত্তা কই।'

'কোথায় বসবি ?'

'আয় না। কাছেই।'

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে গলির মধ্যে একটা দেশী মদের দোকানে যতীন তাকে নিয়ে যায়। শনিবারের বিকাল, ইতিমধ্যেই লোক জমে জায়গাটা গমগম করছে—ছেঁড়া কাপড় পরা খালিগায়ের লোক থেকে ফরসা জামাকাপড়পরা পর্য্যন্ত সব ধরণের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী লোক। দোকান ঘরের বেঞ্চিগুলি সব ভর্ত্তি, দাঁড়িয়ে এবং উবু হয়ে বসেও অনেকে মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে একটা বেঞ্চে জায়গা ছিল, পুলকেশকে বসিয়ে যতীন বলে, 'বোস, একটা পাঁট আনি। একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'আমি তো ওসব খাই না।'

'একদিন একটু খাবি, তাতে কী হয়েছে ? এ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু ফুর্ত্তি না করলে হয় ?'

এখানে ঢুকেই যতীনকে আগের চেয়ে বেশী তাজা, বেশী উৎসাহী মনে হচ্ছে। সেলিব্রেট করার একটা ভাল উপলক্ষ পেয়ে সে যে ভারি খুশী হয়েছে বেশ বোঝা যায়, বেশী মদ খাওয়ার জন্য নিজের মনটা আর তাকে কামড়াবে না। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যুক্তি পেয়েছে, কৈফিয়ৎ পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে বেশী মদ খাবার।

যতীন মদ আনতে যায়, পুলকেশ বসে বসে ভাবে। যতীনের অধঃপতনে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়।

যতীন এসে বসলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কদিন খাচ্ছিস ?'

'বছর তু'তিন ?'

'এটা ধরলি কেন ?'

প্রশ্ন শুনে যতীন হাসে।—'খেলে একটু ভাল লাগে আবার কেন!'

গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খেতে খেতে যতীনের অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে, কথা সে বলতে থাকে তাড়াতাড়ি, বেশী বেশী। একবার চুমুক দিয়েই পুলকেশের সর্ব্বাগে শিউরে উঠেছিল, বমি ঠেলে উঠেছিল। আর খাবার চেষ্টা না করে সে যতীনের কথা শুনে যায়। অদৃষ্ট বড় খারাপ ব্যবহার করেছে যতীনের সঙ্গে, ঘা মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছে জীবনটা, কোনদিন বিশেষ সুবিধা করতে দেয়নি। চাকরীর গোড়ায় বাপ মারা গেল। কিছু টাকা হাতে পেয়ে চাকরী ছেড়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ করেছিল, সুবিধা হল না। বীমার দালালী করেছিল কিছুদিন, সুবিধা হল না। একটা এজেন্সির কারবার ধরেছিল, সেটাতে কিছু হল না। তুটো ছেলে হবার পর বৌটা পড়ল অসুখে, সেই থেকে একটানা ভুগছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল, বোনটাকে তার স্বামী নেয় না। বিরক্ত হয়ে সকলকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সে কলকাতায় নতুন একটা ব্যবসা ফেঁদেছে।

'সংসারের হাঙ্গামা নেই, খরচের টাকা পাঠাই, বাস্। এবার ঠিক গুছিয়ে নেব। তু'বছরের মধ্যে যদি না মোটর কিনি তো—'

জমজমাট নেশা হয়েছে যতীনের। সগর্ব্বে বুক ঠুকে সে পুলকেশকে শোনায় ব্যবসাতে তার কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অল্পদিনে কী ভাবে সে ফেঁপে উঠবে, অন্য লোকেরা কী ভুল করে আর সে কী ভুল করবে না, এমনি সব বড় বড় কথা। জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভের অহঙ্কারেই সে যেন সিধে হয়ে বসে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

পুলকেশ তার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, ন'টার শো-এ প্রিয় ছবিটা তৃতীয়বার দেখতে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, না একাই যাবে।

বেড়া

বাড়ীর ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া! খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারো নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে: ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়ীটাকে সমান দু'ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ ক'রে, উঠান ভাগ ক'রে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল ক'রতে দাঁড় করানো সামনের পর্দ্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দনের বাপ অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল করা পর্দ্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দ্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বড়ীর এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে—গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিক-দের মানতে হ'য়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে

তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্ত্তী জোতির্ব্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু'পশে সদর বেড়া দু'হাত ক'রে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরনো পর্দ্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে ; কারণ ও-বেড়াটাও দু'ভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দু'জনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দ্দন আপত্তি ক'রে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরনো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ীর বৌ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে ? সে এমন কী অপরাধ ক'রেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাকে বন্ধ ক'রতে হবে বেড়ার ফাঁক! রীতিমত সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্দ্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিনহাত বেড়ার ফাঁক-বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দ্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্দ্ধন রাজী আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু'পাশে দু'হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চারহাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দ্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরনো ফাঁক !

এমনি দুর্য্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হ'য়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত

লড়াই হ'য়ে গেছে দু'ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হ'য়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হ'য়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হ'য়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হ'য়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোঁজা হ'য়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হ'য়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত—দু'পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্দ্ধনের মেয়ে পরীবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দ্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান ক'রে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'ভায়ের, ক'দিন পাড়ায় কাণ পাতা গেল না দু'বাড়ীর মেয়েদের গলাবাজীতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হ'য়ে যেত। এঁটো-কাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ-পাশের পুঁই-বেড়া বেয়ে উঠে ওপাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু'পাশের দু'টি পরিবারের মধ্যে যে সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ওপাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলতে না পেরে এপাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয়!

গোলমাল এখনো চলে, বিদ্বেষ এখনো বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মতো খুটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু'পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এ-পাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সী বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা ক'রে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ-পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ী মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজী বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাই-এর প্রতি আরও জোর গলার শাসানোতে, ফের যদি ও-বাড়ীর কারো সাথে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার···

দু'পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশ যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এপাশের বেড়াল ও-পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু'পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বৌ রাণীবালার পোষা বিড়ালটা মেউ

মেউ ক'রে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হ'য়ে, গোবর্দ্ধন একদিন কোথা থেকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ! মাছ দেখে খুসী হ'য়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু'মুঠো চাল সেদিন বেশী নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্দ্ধনের ছেলে সূর্য্যকান্তের বৌ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকান্ত বৌয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্য্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত না ক'রে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থোকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিলনা কিন্তু ঘরে তার একটু নুন আর একটু হলুদ-লঙ্কা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুড়ো চণ্ডী যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু'বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মর কাছে। ও-বাড়ীতে পাঁচুর মা দু'টি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কি কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা-ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা?

'দু'টি চাল দিবি বৌ? দে মা, দু'টি চাল? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুড়ো যা'হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ী আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ীর সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ীর লোক হত্যা না ক'রলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দ্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের স্বরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে?'

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কি। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারো পেট কলমীশাক-সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা ক'রে শুয়ে থাকলেও!

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'জনে মিলে না বেচলে

জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রেছে প্রাণধন চক্রবর্ত্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোন কারণে গোবর্দ্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুস্কিল হবে।

'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবর্দ্দার, ক'দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্দ্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সে-ও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্য্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের ? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ ক'রে। খবর্দ্দার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে ! মুখ বুজে থাকো ক'দিন।'

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু'পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচালো, 'ও কানাই, ওদের বেগুন ক্ষেতে গরু ঢুকেছেরে !' ওপারও চেঁচালো এপারকে শুনিয়ে, 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছে-রে !' আমতলায় কানাই-বলাইকে খেলতে দেখে কোন পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বার বার নিসপিস করে উঠলেও রাণীবালা পর্য্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁই গাছের সতেজ ডগাটি লক লক ক'রে বাতাসে দুলতে লাগলো এপারের এলাকায় !

কথা যা বলাবলি হল তিনদিনে ছ্’পারের মধ্যে, তা’ শুধু গোবর্দ্ধন আর জনার্দ্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এ-ভাবেও তো সাতবছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজেষ্ট্রি করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্দ্ধন বলে, ‘কখন রওনা হবে, জনা?’

‘এই খানিক বাদেই,’ জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দ্দন যোগ দেয়, ‘ফেল্‌নার জ্বরটা বেড়েছে।’

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় ছ্’জনে, জনার্দ্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্দ্ধনকে। একসাথে বাড়ী থেকে বেরোবার কোন দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হ’য়ে তারা সাব-রেজেষ্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলতো। কিন্তু সাত বছর বিবাদ ক’রে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর ছ্’ভাই যখন শান্ত ভাবে ক’দিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার! ছ্’জনে চলতে থাকে একরকম নির্ব্বাক হ’য়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরে ছ্’জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, ছুর্ভিক্ষের গত ছ্’বছরেই যেন বেশী বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কি আছে ভগবান জানেন।

‘দরটা সুবিধা হল না।’

‘উপায় কি?’

‘ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।’

'ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভাল ফসল দিয়েছে গতবার।' গোবর্দ্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—'শোন বলি, জনা। না বেচলে হয় না জমিটা? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু'জনে মিলে।'

'চক্কোত্তি মশায় কি রাজী হবে?'

'রাজী না হয় তো মধু সা'র কাছে বাঁধা দেব। নয় তো রথতলার নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মত। যদি রাখা যায়!'

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ ক'রছে দু'টি সাঙ্গাৎ।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্য্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ, ফিস ফিস ক'রে সূর্য্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনী কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্য্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া কান্না শুনে এপারের বাকী সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া কান্না উঠেছে জনার্দ্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু'দিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হ'য়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মত কাণ্ড আরম্ভ করলে

সূর্য্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন যখন বাড়ী ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাতুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হ'য়ে গেল দু'পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরানো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তা'হলে দেবতা হ'য়ে যেত! তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করাবার তাগিদ কোন পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙে জ্বালান হতে লাগলো দু'পারেরই উনানে। দু'পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হ'য়ে যেতে লাগলো বেড়ার টুকরোর আবর্জ্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ীর মেয়েদের ঝাঁটায় দু'টির বদলে একটি উঠান তকতক ক'রছে।

তারপর ?

কাণকালি গাঁয়ের খালে একবার একটা কুমীর এসেছিল। মানুষখেকো মস্ত কুমীর। পরপর তিনটি বৌকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের। একজন মাঝবয়সী, দুজন তরুণী। একজন রোগা ন্যাংলা, একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন ছিপছিপে দোহারা গোছের লম্বাটে। মোটা বৌটি কুমীরের পেটে গিয়েছিল একাই। অন্য বৌ দু'টির একজনের গর্ভ ছিল সাত আট মাস, অন্যজনের কাঁখে ছিল ছোট একটি শিশু। তার পেটেও একটা কিছু ছিল ক'য়েক মাসের। তাকে যখন কুমীর ধরল, বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে সে যত জোরে যত দূরে পারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মায়ের প্রাণ তো!

কান্তি দাসের বিধবা বোন সনকা বাচ্চাকে তুলে আনে।

সেই শিশুর বয়স এখন পনের বছর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে! টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই অকেজো, আঙ্গুল গুলি শক্ত হয়ে গেছে, বাঁকে না। ডান হাতে বেশ জোর আছে, বিশেষ কর্ম্মতৎপর নয় বটে, কারণ কোন কাজেই পটুতা অর্জ্জন করার ধৈর্য্য তার নেই, কিন্তু হাতটি যেন সব সময়েই কাজের জন্য অস্থির ও চঞ্চল হয়ে থাকে, অথবা অকাজের জন্য। তার বাবা গিরিশ আবার বিয়ে করেছিল এগার মাসের মধ্যেই, কিন্তু প্রথম পক্ষের একমাত্র খুঁতে ছেলেটাকে মানুষ করার চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি—

স্কুলে পর্য্যন্ত দিয়েছে। স্কুলে গজেন ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত উঠেছিল। ফেল করেই করেই সে ক্লাসে উঠেছিল বরাবর কিন্তু একবার, ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠেছিল ফার্স্ট হয়ে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই চমকপ্রদ ঘটনায়। কিন্তু শুধু ওই একবার। তার আগে বা পরে আর কখনো সে পরীক্ষায় পাস করেনি—একমাত্র ড্রয়িং-এর পরীক্ষা ছাড়া। ড্রয়িং-এ তার হাতটা ছিল পাকা। এক হাতে এত সহজে এত ভাল ড্রয়িং সে করতে পারত যে অন্য ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ড্রয়িং মাস্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখী ও গাছ জীবন্ত হত বেশী। তবে ছেলেবেলাতেই কেমন বখাটে হয়ে গেল ছেলেটা। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করার পর আর তাকে পড়ানোই গেল না। পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারীর পর গিরিশ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেবার পরেও সে অবশ্য গিরিশের বাড়ীতেই থাকে। তাড়ানো ছেলের মতো থাকে।

এই বয়সেই দড়ির মতো পাকিয়ে দেহের মাংসপেশীগুলি তার শক্ত হয়ে গেছে, রোগা শরীরটাতে শক্তি আর সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্যরকম। মুখে স্থায়ী ছাপ পড়েছে একটা শ্রান্ত সকরুণ জিজ্ঞাসার, ভাঙা বাঁকা নাকটা যেন জিজ্ঞাসার ভারেই নুয়ে গেছে। আর কী ভীরু তার দুটি চোখ! সবাই যেন যখন তখন তাকে মারে, আপন পর ছোট বড় দেবতা মানুষ নারী পুরুষ যে যেখানে আছে। নিরুপায় সহন-শীলতায় সে যেন চুপচাপ সয়ে যায়। অসহ্য হলে অন্তরালে কাঁদে।

মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য সে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। এবার প্রায় ছ'মাস কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এল কেউ জানে না। সবাই

যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আরও অনেকের মতো সেও দুর্ভিক্ষের কবলে গেছে চিরদিনের মতো তখন সে একদিন ফিরে এল। সাজপোষাকের তার উন্নতি দেখা গেল অদ্ভুত রকমের—সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাইন ধুতি, চকচকে বার্ণিশ করা জুতো। গাঁয়ে থাকবার তার ঝোঁক দেখা গেল না, যদিও গিরিশ আর বাড়ীর লোকের কাছে খাতিরের এবার আর সীমা রইল না তার। দু'একদিন থাকে, ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ জমায়, বড়ই তাকে মিশুক বলে মনে হয় এবার। ক্ষণে ক্ষণে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে উদ্ভট চেহারার একটা কেস বার করে তা থেকে খাঁটি মার্কিন মিলিটারী সিগারেট নিয়ে টানে—আগে সে তামাক আর বিড়ি খেত, মাঝে মাঝে পয়সায় দুটোওলা সিগারেট।

লালু আর মবুবকেও সিগারেট দেয়। ওদের সঙ্গে এবার তার বড় ভাব হয়েছে। লালুর বয়স এগার বছর, ববুবের বার। সমবয়সী বয়স্ক লোকের মতোই তারা তাদের মেয়ে সংক্রান্ত ব্যবসার কথা বলে, অশ্লীল হাসিতামাসাগুলি পর্য্যন্ত তাদের হয় বয়স্কদের মতো।

গজেন বলে, 'মদনের বোনটা পিছায় কেন রে?'

লালু বলে, 'ডরায়। লালমুখো গোরাদের যদি ধরিয়ে দি?'

'লালমুখো গোরা কিসের?' গজেন বলে বেজার হয়ে।—'মোদের বিবি'সাব কি কয়? মেহের বিবিসাব?'

মবুব বলে, 'কয় কি, তোরা পোলাপান, তোদের কথায় গিয়ে মরব?'

'পোলাপান ঠাউরেছে, না?'—একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিতে তারা যে

পাকাপোক্ত পুরুষের চেয়ে বেশী কিছু সেটা প্রমাণ করে তিনজনে হাসে। মানুষ বুড়ো হয়ে মরে গিয়ে যত বুড়ো হয় গজেন তার চেয়ে পাকা। হাসাহাসির পর সে বলে, 'তা কথা বেঠিক না। মাগী ছাড়া মাগীরা ভরসা পায় না। চপলার জন্যে এ মুশকিল।'

চপলার খারাপ রোগ হয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। দামী কাপড় পরে হাসিমুখে সে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কটিবাজারে কাজ করতে যাবার জন্য মেয়েদের ভরসা দিতে পারে না।

কথাটা ভাববার মতো। ভাবতে ভাবতে গজেন বাড়ী যায়। বাড়ী পৌঁছেই ভাত বাড়বার হুকুম দেয়, এখুনি তাকে কটিবাজার রওনা হতে হবে। রোজগেরে ছেলেকে বাড়ীর মেয়েরাই সাগ্রহে ভাত বেড়ে দিত কিন্তু তারা কেউ নড়বার চড়বার আগেই ওবাড়ীর হাবো যেন উড়তে উড়তে পিঁড়ি পেতে তার ভাত বেড়ে এনে দেয়! গজেনের নতুন মা, মাসী আর পিসীরা অসন্তুষ্ট হয়ে আড়চোখে তাকায়। ছুঁড়ি যে গজেনেরি দেওয়া নতুন রঙীন শাড়ী পরে এ বাড়ীতে এসে ফর ফর করে উড়ছে, এতে তাদের চোখ জ্বালা করে আরও বেশী।

'ফিরবে কবে?' সভয় ভক্তিতে হাবো জিজ্ঞেস করে। গলা তার প্রায় বুজে আসে আবেগে।

'পরশু তরশু ফিরব।'

হাবোকে মন্দ দেখাচ্ছে না রঙীন কাপড়ে, গজেন ভাবে। একটু আশ্চর্য্য হয়েই সে মেয়েটার সারা গায়ে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নেয়—মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এদিক ওদিক আর তার একান্ত অনুগত এই যে একটা মেয়ে আছে এর কথা তার খেয়ালও হয় নি

একবার। একটু হাবাগোবা মেয়েটা, চোখ একটু ট্যারা, হাড়গিলের মতো রোগা শরীর। কিন্তু বয়েস তো কম! তাছাড়া, এরকম হাবা গোছের মেয়েই ভাল, সহজে বাগানো যায়, ভয় দেখিয়ে সহজে কাবু করা চলে।

'হাবো, সঙ্গে যাবি? কাজ করে খাবি? কাপড় গয়না পাবি?'

'যাবো!'

হাবোর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

চিরদিন এই মেয়েটা কেন যে তার এত অনুগত গজেন জানে না—পৃথিবীতে এই একজন! কোনদিন ভাবেও না। হাবো তার কাছে অতি সস্তা, তাকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভক্তি করে বলে। তার পঙ্গু, বিকারগ্রস্ত জীবনেরই একটা অঙ্গ হিসারে মেয়েটা তারে জীবনে মিশে ছিল বরাবর। আছে তো আছে, এইভাবে। তার নতুন ব্যবসায়ের কাঁচা মাল হিসাবে আজ মনে মনে ওকে যাচাই করতে গিয়ে মেয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠে তার এলোমেলে ভাবনা জাগে। কেমন আঁকুপাঁকু করে মনটা নানা বিরুদ্ধ চিন্তায়। বিধবা ভাগ্নী রাসিকে হারাধনের আস্তানায় পৌঁছে দিতে পারলে কী রকম হয়। রাসি খুব রূপসী, ওকে দেখলে কথাটা সে না ভেবে থাকতে পারে না। ভাবতে গেলে আবার কেমন জ্বালাপোড়া আর অস্থির ভাব স্থুরু হয়। সে কি আর সত্যি নিজের ভাগ্নীকে হারাধনের কবলে দিয়ে আসবে। কিন্তু তবু ভাগ্নীটার জন্য সে জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। ওকে দেখলেই মন তার দাম কষা স্থুরু করে!

হাবো তার সঙ্গেই বার হয়। অনেকক্ষণ হাঁ করে থাকায় লালা

গড়িয়ে পড়েছিল, সসপ্ করে একবার লালা টেনে সে মুখটা বন্ধ করে দেয়। কয়েকটা বাড়ী পরেই হাবোর বাবা দয়ালের খড়ের ঘর। গজেনের সঙ্গে মেয়েকে আসতে দেখে দয়াল ভ্রূকুটি করে তাকায়, কিন্তু গজেন কাছাকাছি এলে তার মুখখানা বেশ অমায়িক মনে হয়।

'তেল একটিন দিলি না বাবা?'

'দেব দেব। পরশু কি তরশু নিয়ে আসব সাথে।'

কোটের বাঁ হাতটা ঝুলছিল লড়বড় করে, ডগাটা পকেটে গুঁজে সে খাল ধারে এগিয়ে যায়। মিলিটারী, সরকারী, আধা-সরকারী আর লাইসেন্সী নৌকা চলছিল খাল দিয়ে। একটা নৌকাকে সে হাঁক দেয়, জানায় তার পাশ আছে। নৌকা ধারে এসে তাকে তুলে নেয়।

কটিবাজারে সমারোহ ব্যাপার। চারিদিকে অস্থায়ী চালাঘরের অরণ্য, মাছির মতো মানুষের ভিড়, নতুন রাস্তা কাঁপিয়ে হরদম লরীর আনাগোনা। ফাঁকায় পাহাড় সমান স্তূপাকার চালের পচা গন্ধে চারিদিক মসগুল।

হারাধনকে গজেন ক্ষেন্তির ঘরে খুঁজে বার করে। হারাধন লোকটা বেঁটে ও বলিষ্ঠ, ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক করা, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। এই অবেলায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে ফেলেছে।

'মাগী চাই একটা।'

গজেন তাকে খবরাখবর দেবার পর হারাধন বলে এক ঢোঁক মদ গিলে। ছোট ছেলে দিয়ে একদিকে যেমন সুবিধা আছে, অন্যদিকে তেমনি অসুবিধাও অনেক। ছোট ছেলে যে কোন বাড়ী গিয়ে যে কোন

মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কেউ কিছু সন্দেহ করে না। মেয়ে লোক কেউ আনাগোনা করলে বরং খটকা লাগতে পারে লোকের মনে কিন্তু এগার বছরের ছেলে যে মেয়ে ভজানোর কাজে লেগেছে লোকের এ ধারণা সহজে হয় না। কিন্তু অতটুকু ছেলের কথাতে আবার ভরসা করতে মেয়েরা সাহস পায় না, এই হল মুস্কিল। খাঁটি গেরস্ত ঘরের দু'তিনটি মেয়ে প্রায় তৈরী আছে, চপলার মতো চালাকচতুর হাসিখুসী নাদুসনুদুস একজন মাগীর এখন একবার গাঁয়ে ঘুরে আসা দরকার। শাড়ী গয়না পরে গিয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে আসবে ওদের যে ওদের জন্যও কেমন পেট-ভরা খাওয়া, ভাল ভাল কাপড় আর দামী দামী শাড়ী গয়না রয়েছে তৈরী হয়ে, কটিবাজারে এসে খেটে উপার্জ্জন করে নিলেই হয়।

'বেশী গয়না না কিন্তু।'

গজেন তা জানে। বেশী গয়না দেখলে খটকা লাগে মানুষের মনে। গরীব মানুষের মনে।

'না, বেশী গয়না না।'

দুদিন পরে ফুল, একটিন কেরোসিন এবং আরও নানারকম জিনিষপত্র নিয়ে গজেন নৌকায় কাণকালি আসে। ফুল দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয় কিন্তু তার চেহারায় একটা আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে ঘরোয়া ভাবের। মা শিশুকে আদর করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে তখন তার যে রকম মুখের ভঙ্গি হয় তারই স্থায়ী ছাঁচে ঢেলে যেন মুখখানা গড়া হয়েছে ফুলের। তার কথা মিষ্টি, হাসি মোলায়েম। তবু তাকে যারা চেনে তারা তাকে ভয় করে। এই শান্ত

নম্র গেরস্ত বৌটির মতো চেহারার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে তার ধারে অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কাণকালি পৌঁছে একটা দুঃসংবাদ শোনা যায়। কোন এক নারী-সজ্ঘ থেকে দুজন মহিলা কর্ম্মী গাঁয়ে এসেছে আগের দিন সকালে। বৈরাগী দাসের সেই বৌটাকে তারা সঙ্গে এনেছে কটিবাজারের বাজার থেকে সংগ্রহ করে, ওদের কথায় জীর্ণ শীর্ণ জ্বরগ্রস্ত বৌটাকে বৈরাগী ক্ষমা করেছে, গ্রহণ করেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়ে দুজন সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে লোকের কথায় ভুলে মেয়েরা যেন কোথাও না যায়। লোভে পড়ে গিয়ে দুদিনে মেয়েদের কি অবস্থা হয়, রোগে ব্যারামে শরীর একটু ভাঙ্গলেই কি ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়, বাগে পেলে কি ভাবে দূরে দূরে চালান করে দেওয়া হয় সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বৈরাগী দাসের বৌটাকে সামনে ধরছে প্রমান হিসাবে।

সঙ্গে দুজন বাবু আছে তাদের। লালু আর মবুবকে তারা কত উপদেশই যে দিয়েছে! স্কুলের ছেলে তারা, এই বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খারাপ কাজে লাগা কি উচিত?—এমনি সব বড় বড় কত কথা।

'সিগারেট চাইতে ছোকরা বাবুটা রেগে টং!'

লালু আর মবুব খিলখিলিয়ে হাসে।

গজেন চিন্তিত হয়ে ফুলকে নৌকায় রেখে একাই নেমে যায়। অবস্থাটা ভাল করে না বুঝে মাগীটাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের মধ্যে যেতে তার ভরসা হয় না। কেরোসিন তেলের টিনটা সে সঙ্গে নিয়ে দয়ালের বাড়ী পৌঁছে দেয়।

তখন শেষ দুপুর। বাকী বেলাটা সারা গাঁয়ে ঘুরে গজেন ভড়কে যায়, চটেও যায়। যারা তাকে দেখতে পরাত না কোনদিন তাদের কথা বাদ যাক, জিনিষপত্র দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে যে সব দুর্ব্বল অসহায় মানুষের কাছে তার বেশ খাতির জমেছিল তারাও যেন অনেকে কেমন দূরে সরে গিয়েছে, তাকে ভাল করে আমল দিতে চায় না। ঘোষপাড়ায় ঢুকবার পথে পাড়ার পাঁচটা ছেলে তার পথ আটকাল, স্পষ্ট বলে দিল পাড়ায় ঢুকলে তার একটি মাত্র আস্ত হাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে দেবে। হাত কার ভাঙ্গে আর কার আস্ত থাকে গজেন তা দেখে নেবে, কিন্তু অবস্থা তো সুবিধাজনক নয়। মদন আমতা আমতা করে আবোল তাবোল কি যেন বকল। তার বোনটা কথাই বলল না তাদের সঙ্গে। মেহের দরজা খুলল না।

সন্ধ্যার সময় মন খারপ করে গজেন নৌকায় ফিরে যায়। দুচোখে তার ঘনিয়ে আসে গভীর বিষাদ। নৌকার গলুই-এ বসে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে এক অজানা দুর্ব্বোধ্য বেদনার রহস্যময় সঞ্চারে তার মন উদাস অবসন্ন হয়ে আসে। বিকৃত উত্তেজনার অবসান ঘটলেই চিরদিন তার এরকম মন কেমন করে।

ফুল বলে, 'কি গো, ভাব লাগলো ?'

'ভাবছি। আজ নামা হয় না, নায়ে থাকবো।'

'ও বাবা, ডর লাগবে।'

'আমি থাকবো।'

'তাতে বুঝি ডর কম ?'

ফুলের পিপাসা পেয়েছিল। আজ আর নামতে হবে না স্থির

হওয়ায় সে বোতল বার কয়ে তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করে। গর্জেনকে ডেকে নেয় ছই-এর মধ্যে। সেখানে কড়া মিলিটারী চোরাই মদ আর ফুলের সাহচর্য্যে ক্রমে ক্রমে গজেনের উত্তেজনা ফিরে আসায় কাব্যিক বিষাদ কেটে যায়।

আরও কিছু পরে বেশ মেতেই ওঠে তারা দুজনে।

ছই-এর বইরে হাবোকে প্রথম দেখতে পায় ফুল। গজেনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলে, 'তুমি কে গো?'

গজেন মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কিরে হাবো? কি করছিস হেথা?'

হাবো পা গুটিয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে হাঁ করে দেখছিল। মুখ দিয়ে তার লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নৌকার পটাতনে জমেছে। সসপ্ করে লালা টেনে মুখ বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ায়, এক লাফে ডাঙ্গায় পড়ে, ছুট দেয় গাঁয়ের দিকে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজবার খনিক পরে দয়ালের বাড়ীতে 'আগুন! অগুন!' চীৎকার ওঠে। পাড়ার লোক হৈ হৈ করে ছুটে যায়। পুরো একটি কেরোসিন গায়ে বিছানায় ঢেলে হাবো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘরে পর্য্যন্ত অগুন ধরে গেছে দয়ালের।

খবর শুনে বৈরাগী দসের বৌ চোখ বড় বড় করে বলে, 'এক টিন তেল! কুপি জ্বালার তেল মেলে না এক ফোঁটা, ছুঁড়ি একটিন তেল ঢেলেছে।'

অনেকেই আপশোষ করে।

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই

কৈলাস বসুকে সকলে স্বার্থপর আর সঙ্কীর্ণচেতা বলে জানে। মানুষটার চালচলন আচার ব্যবহার তো বটেই, চেহারাও সকলের এই ধারণাকে অনেকটা সমর্থন করে। বেঁটে, আঁটোসোটো ধরণের মোটা, প্রায় গোলাকার মাথায় বুরুষের মতো শক্ত ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, লম্বা নাকের দু'পাশে মোটা ভ্রূর নীচে খুদে খুদে দু'টি চোখ। চোখ দু'টিকে কটাই বলা চলে। ছোট এবং কটা, তবু সে চোখের দৃষ্টি বড় বড় নিকষ কালো চোখের অধিকারীদের কাছে বড় বেশী স্পষ্ট সমালোচনা আর তিরস্কারে ভরা মনে হয়। মুখের আটক নেই এমন অভদ্র মানুষকে এড়ানোর মতো সকলের চোখ তাই কৈলাস বসুর চোখকে এড়িয়ে চলে।

কৈলাস কথা যে কম বলে তা নয়, মৃদু রসিকতা ভরা হাসির সঙ্গে মিষ্টিকথাই সাধারণত বলে, তবু লোকের মনে হয় সে যেন বড় বেশী গম্ভীর, সব সময় মুখ বুজে কেবল নিজের কথা ভাবছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায়ই তার কথার কোন যোগ থাকে না। অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে হয়তো তার দেখা হয়ে গেল, তাকে চমকিয়ে দেবার জন্য অবিনাশ হয়তো সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোষালের কীর্তিটা শুনেছেন, দাদা—ওপাড়ার কেদার ঘোষালের নতুন কীর্তি? ছি, ছি! ভদ্দরলোকের এমন পিরবিত্তি হয়, এমন কাজ ভদ্দরলোকে করে!—'

কৈলাস হয়তো জিজ্ঞেস করে, 'ছেলের কোন খপর পেলেন চক্কোত্তি মশায় ? চিঠিপত্র এল ?'

অবিনাশ একটু দমে যায় ! সহরবাসী রোজগেরে ছেলে তাকে ত্যাগ করেছে সত্য, চিঠিও লেখে না খবরও পাঠায় না, কিন্তু এই কি সে কথা তুলবার সময় ! সহানুভূতি জানানোর তো সময় আছে ? তবু ধৈর্য্য ধরে • অবিনাশ হয়তো বলে, 'না, চিঠিপত্তর পাইনি। কি জানেন দাদা, এ যুগটাই এ রকম, কারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। নইলে ঘোষাল এমন কাণ্ডটা করতে পারে ? বামুন মানুষ তুই, গলায় তোর পৈতে আছে, সন্দেবেলা তুই কিনা এক জেলেমাগীর ঘরে—'

কৈলাস হয়তো আবার বলে, 'সেই যে পাত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন খুকীর জন্যে, কতদূর এগোল প্রস্তাবটা ?'

অবিনাশের হাতদাঁত সুড় সুড় করে, কৈলাসের গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে, গায়ের কোথাও কামড়ে দিতে।

নবীন সরকারের দাওয়ায় বসে হয়তো পাঁচজনে নানা কথা আলাপ করছে। সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সেক্রেটারী কিসে সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলল যে সাত টাকা এগার আনা বিপিন মুদীর দোকানে ধার থেকে গেল, সকলে যখন এ সমস্যার কুলকিনারা পাচ্ছে না, কৈলাস হয়তো তখন আপন মনে বকে চলেছে, এ বছর বর্ষা কম হওয়ার ফলটা এ পর্য্যন্ত কি দাঁড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে। গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার সময় ভূষণের বিধবা শালীর গর্ভটা ঠিক ক'মাসের হয়েছিল, সকলে যখন এই তর্কে মসগুল হয়ে আছে, কৈলাস হয়তো তখন কেবলই সকলকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে

যে, বিপিন মুদীর দেকানে ছুর্গোৎসবের ধারটা সে এখন ঘরের পয়সা দিয়ে মিটিয়ে দেবে বলেনি, কয়েকজনের কাছে তার যে টাকাটা পাওনা আছে সেটা পেলে তখন মিটিয়ে দেবে।

এ কি কথা বলা? আলাপ করা? এভাবে কথা বলার চেয়ে মুখ বুজে থাকা কি ভাল নয়?

কৈলাস কখনো কোথাও চার আনার বেশী চাঁদা দেয় না, কোন উপলক্ষেই নয়। অন্তত পাঁচ টাকায় বিক্রী করা চলে এমন কিছু বাঁধা না দিলে পাঁচটা টাকা ধার পর্য্যন্ত দেয় না। পাড়ায় যে থাকে, যার ছেলে সহরে একশ' টাকা বেতনে চাকরী করে, তাকে পর্য্যন্ত নয়! হাসি মুখে আবার বলে যে, এভাবে টাকা ধার না দিলে শোধ করার কথাটা কারও মনে থাকে না, শোধ করার চেষ্টাও থাকে না। সকলের চোখের উপরে নিজের খুসীমত সে একটি ছোট পাকা বাড়ী তুলেছে— ক'খানা এবং কতবড় ঘর করা উচিত, দরজা জানালা কি রকম হলে ভাল হয়, এসব বিষয়ে কারও একটা পরামর্শও কাণে তোলেনি। পথ সংক্ষেপ করতে সকলে পায়ে পায়ে তার জমির উপর যে পথটি গড়ে তুলেছিল, বিনা দ্বিধায় তার উপর রান্নাঘর তুলে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুযোগ অভিযোগের জবাবে হাসিমুখে বলেছে, কয়েক গজ বেশী হাঁটা মানুষের পক্ষে সমান কথা। পঞ্চাশ হাত তফাতের পথটাতেই যখন কাজ চলে সে কেন অন্য যায়গায় রান্নাঘর তুলে অসুবিধা ভোগ করবে?

কেদার ঘোষাল সকলকে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু কেউ সাহস করেনি। অন্য লোকে হয়তো মামলার নামেই একটা

মিটমাটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, তার জমির উপর দিয়ে পাড়ার লোকের হাঁটবার অধিকারের বদলে কমপক্ষে পাড়ার লোককে মস্ত একটা ভোজ দিয়ে দিত। কিন্তু কৈলাস হয়তো মামলার নামেই আগে কলকাতা থেকে উকিল ব্যারিস্টার আনাবার ব্যবস্থা করে রাখবে।

কৈলাসের স্ত্রী অভয়ার একটু ঝগড়া করা সখ। কিন্তু সাতটি ছেলে-মেয়ে আর স্বার্থপর স্বামীর জন্য বেচারীর সখটা ভাল করে মিটতে না মিটতে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করে বলে, 'মানুষের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে পার না ?'

কৈলাস আশ্চর্য্য ও আহত হওয়ার ভাণ করে বলে, 'কেন, তোমার সঙ্গে মানিয়ে চলি না ?'

'মানিয়ে যা চল তা ভগবানই জানেন। আমার কপাল মন্দ তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। লোকের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াও কেন তুমি ? তোমার কি দরকার নিন্দে করে ? সকলকে চটিয়ে লাভ কি শুনি ?'

কৈলাস জবাব দেয় না। এও তার এক ধরণের স্বার্থপরতা, নিজেকে সমর্থন করার জন্যও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। অভয়ার অনুযোগটাও মিথ্যা নয়। কারও কুৎসা কৈলাস কাণে তুলতে চায় না, উৎসাহী প্রচারককে বাজে কথা বলে দমিয়ে দেয়, তবু যে কী করে কুৎসা-প্রচারক হিসাবে তারই নামে কুৎসা রটে যায়! তার কথায় লোকে বিশ্বাস করে বলে হয়তো প্রচারকামীরা ইচ্ছা করে তার নামটা ব্যবহার করে। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সে এমনভাবে নিজের নিজের অন্যায়গুলি উপলব্ধি করায় যে অন্যের

অপবাদ কাণে এলে সকলের মনে হয়, সে ছাড়া আর কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরের অপবাদ দেখিয়ে দেবে ?

কেদার ঘোষালের আধুনিকতম কলঙ্কের সঙ্গে তার নামটা বড়বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। অবিনাশ চক্রবর্ত্তী রাধারমণ ভট্টাচার্য্যকে বলেছিল, 'কৈলাস বোসের অহঙ্কার আর তো সয়না দাদা। নিজের চোখে যা না দেখবে তাই হেসে উড়িয়ে দেবে, সবাই যেন মিথ্যেবাদী। কেদার ঘোষালের ব্যাপারটা বললাম, শুনে আমার সঙ্গে তামাসা জুড়ে দিল। আমি যেন ওর তামাসার পাত্তর !'

আরও অনেক কথা অবিনাশ বলেছিল ! পরদিন রটে গিয়েছিল, কৈলাস স্বীকার করেছে যে সে নিজের চোখে কেদার ঘোষালকে জেলেমাগীর ঘরে ঢুকতে দেখেছে। রটনাটি আরও খানিকটা বিকৃত-ভাবে স্বয়ং কেদার ঘোষালের কাণে গিয়ে পৌঁচেছে !

সুতরাং কেদার ঘোষাল ভয়ানক চটে গেছে ! কৈলাস বদনাম রটিয়েছে বলে শুধু নয়, বদনামটা একেবারে মিথ্যা বলে। জেলে পাড়ায় কেদার গিয়েছিল কিন্তু কোন জেলেমাগীর ঘরে ঢোকেনি। কে না জানে যে আজকাল সে কেবল জেলে পাড়া নয়, কুমোরপাড়া, তাঁতি পাড়া, বাগদী পাড়া সব পাড়াতেই যাতায়াত করছে ? মিউনিসিপ্যালিটির সে সদস্য, এখানকার সর্ব্বপ্রধান নেতা, সে যদি ওসব পাড়ায় না যায়, কে যাবে ? এতদিন প্রয়োজন ছিল না, যায়নি, এখন প্রয়োজন হয়েছে, যাচ্ছে। ওসব গরীব দুর্ভাগাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সে যে চেষ্টা আরম্ভ করেছে, সেটা তো সকলে জানে ? অন্তত, জানা তো উচিত সকলের ? তবু তার নামে এই মিথ্যা বদনাম !

আসলে বদনামটা কিন্তু খুব বেশী ছড়ায়নি। দু'চারদিন একটু ফিসফাস করে চুপ করে গিয়েছিল! কেদারের চরিত্রগত বেশ সুনাম আছে চারিদিকে। সকলে তাকে ভদ্র, সংযত, ভালমানুষ বলেই অনেকদিন হতে জানে। মানুষটা সে উদার, পরোপকারী। সর্ব্বত্র সে যে অনেকের চেয়ে বেশী টাকা চাঁদা দেয় তা নয়, মাঝে মাঝে নানা প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানও করে। তাকে ছাড়া সভাসমিতি হয় না, নতুন পরিকল্পনা দাঁড়ায় না। স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তার যোগ আছে। বন্ধু ও পরিচিত সকলেই তাকে পছন্দ করে, অনেক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে তার পরামর্শও জিজ্ঞেস করতে আসে।

একটিমাত্র খাপছাড়া বানানো বদনামে এরকম জনপ্রিয় মানুষের সুনাম নষ্ট হয় না। তবু, একটু ভয় পেয়ে ছোটলোকদের পাড়ায় যাওয়া কেদার অনেক কমিয়ে দিল : এক মাসের মধ্যে জেলেপাড়ার ধারেকাছেও ভিড়ল না। কিন্তু একেবারে না গেলেও তো চলে না, নেতৃত্ব বজায় রাখা চাই। তাছাড়া ওদের অবস্থাও সত্যসত্যই বড় শোচনীয়, ওদের জন্য যতটুকু পারা যায় না করলেই বা চলবে কেন? তাই, সকালের দিকে মাঝে মাঝে কেদার ওসব পাড়ায় যায় এবং কমপক্ষে সাত আটজন অনুগত ও উৎসাহী কর্ম্মীকে সব সময় বডিগার্ডের মতো সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

আগেও অবশ্য এ রকম বডিগার্ড দু'একজন কেদারের সঙ্গে থাকত। একা ওসব পাড়ায় যেতে তার চিরদিনই ভয় করে। এখন ছোটখাট একটি দল বেঁধে যায়, কেউ যাতে আর কোনমতেই

ভুল করতে না পারে যে তার ভাল ছাড়া মন্দ কোন উদ্দেশ্য আছে।

কৈলাসও মাঝে মাঝে ওসব অঞ্চলে যায় তবে কেদারের মতো কখনও নেতা হিসাবে উপরে উঠবার প্রেরণায়, কখনও গরু ছাগলের মতো যারা জীবন কাটায় তাদের জন্য কিছু করবার সখে, কখনও বা নবযুগের নতুন মতাবলম্বী অল্পবয়সী অনুগত কর্ম্মীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় অবশ্য ওদিকে যায় না, নিছক তার নিজের দরকারে। ওখানকার অনেকেই তার কাছে টাকা ধারে। টাকার পরিমাণটা অবশ্য খুবই কম, গরীবকে কৈলাস কখনো দু'পাঁচ টাকার বেশী ধার দেয় না এবং সুবিধামত হয় টাকায়, নয় মাঠের ধানে, বিলের মাছে, গোয়ালের দুধে, তাঁতের কাপড়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়! কৈলাসের নিজের কিছু জমি আছে, সেই জমিতে খেটে যদি কেউ দেনা শোধ করতে চায় তাতেও কৈলাস আপত্তি করে না। তবে সুদটা কৈলাসকে নগদ দিতে হয়—পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক এক পয়সা সুদ!

মফঃস্বলের ছোট সহর, কোথায় সহরের শেষ আর গ্রামের আরম্ভ সরকারী কগজপত্রের নির্দ্দেশ দেখেও সেটা ঠিক করা যায় কিনা সন্দেহ একদিন তাই নকুড় পালের বাড়ীর সামনে কৈলাস আর কেদারের দেখা হয়ে গেল। এগারজন বডিগার্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কেদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাত তিনেক তফাতে নকুড়ের আশেপাশে এলোমেলোভাবে দঁড়িয়ে আছে পাড়ার কুড়ি বাইশজন লোক। কমবয়সী ছেলেমেয়েও জুটেছে অনেক, কছোকাছি প্রায় সমস্ত বাড়ীর বেড়ার ফাঁকে মেয়েদের মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সকলকে জড়ো করে কেদার সবে বলতে আরম্ভ করেছিল, কৈলাস একপাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। কৈলাসের উপর রাগ ছিল, সেইজন্য বোধ হয় তাকে দেখে কেদারের উৎসাহ গেল বেড়ে, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রোগ আর দারিদ্র্যের পীড়নে সকলের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে সকলকে তাই ভাল করে বুঝিয়ে দিল। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলের যে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা বুঝিয়ে দিতেও তার সময় লাগল অনেকটা।

কেদারের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা, ঠিক বলেছেন।' তারপর মুখে একটা জোরালো আপশোষের আওয়াজ করে বলল, 'তবে কি জানেন, বেচারীরা করবে কি, করবার যে কিছু নেই!'

কেদার রাগ করে বলল, 'করবার কিছু নেই মানে?'

'কি আছে বলুন?'

'ওই যে বললাম, সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে?'

বেশ বুঝা যাচ্ছিল কেদারের বক্তৃতায় কৈলাসের মন রীতিমত নাড়া খেয়েছে, এ কথায় সেও যেন রেগে গেল, 'আপনি তো বলে খালাস চেষ্টা করতে হবে বলে। কী চেষ্টা, কিসের চেষ্টা তা বলুন?' তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, 'যাক যাক আমার ওসব কথায় কাজ কি! আপনার ছেলের জ্বর কমেছে কেদারবাবু?—আমার সেই টাকাটা নকুড়?'

নকুড় কাছে এগিয়ে এল, নীচু গলায় বলল, 'আজ তো লরাব কর্তা।'

কৈলাস মাথা নেড়ে বলল, 'তাকি হয় হে, আজ না পারলে কবে পারবে ? পরশু ধান বেচার টাকা পেয়েছ, তিন টাকা তিন পয়সা দিতে পারবে না ?'

নকুড় বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল কারও কাণে গেল না। হঠাৎ কেদার বলল, 'আপনিই বা এমন নাছোড়বন্দা কেন মশায় ? গরীব মানুষ এত করে বলছে, তিনটে টাকার তো মামলা, কদিন পরেই না হয় আদায় করবেন ?—আচ্ছা, এই নিন, আমি দিচ্ছি আপনার তিনটাকা শোধ করে। তুমি তোমার সুবিধে মতো আমায় টাকটা দিও নকুড়, আর যদি নেহাৎ নাই দিতে পার—'

নকুড় প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কেদারকে মনিব্যাগ হতে টাকা বার করে কৈলাসের দিকে বড়িয়ে দিতে দেখে তাড়াতাড়ি ঠিক ম্যাজিকওয়ালার মতো কোমরের ভাঁজ হতে ঠিক তিন টাকা তিন পয়সা বার করে ফেলল। টাকাটা কৈলাসের হাতে দিয়ে লজ্জার হাসি হেসে সবিনয়ে কেদারকে বলল, 'না, বাবুমশায়, না। মোর থেকে মিটমাট হয়ে যাকগা—হাঙ্গামায় কাজ কি ?'

তারপর কৈলাস বলল, 'এবার ফিরবেন তো ? চলুন এক সঙ্গেই যাই।'

কৈলাসের আরও কয়েকটি অদায় বাকী ছিল, কেদারও ঠিক করেছিল কিছু তফাতের আরেকটি পাড়া আজ ঘুরে যাবে। নিজের নিজের কাজ বাতিল করে দুজনে একসঙ্গে ফিরে চলল পাশাপশি, নিঃশব্দে—অনেকটা বন্ধুর মতো। কৈলাস নিজে হতে কথা পড়বে না বুঝে কেদার শেষে বলল, 'আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

কৈলাস বলল, 'কী করি বলুন, উপায় কি!'

'আপনার মন বড় ছোট।'

'তা বটে। একজনের তিনটে টাকা বলে উদারতা দেখালেন, ওরকম দু'শো চারশো হলে করতেন কি? এখনও প্রায় তিনশ লোক আমার কাছে টাকা ধারে।'

'আমি হলে চাইতে পারতাম না—দান করে দিতাম।'

'কবার দিতেন? দু'দশ টাকা দিলেই যদি চিরকালের জন্যে ওদের অভাব মিটে যেত তবে আর ভাবনা ছিল না! ফাঁকে তালে কিছু লাভ করার সুযোগ পেলে বরং ওদের স্বভাবটাই বিগড়ে যেত। ওদের আপনি জানেন না। নিজের যার রোজগার নেই অন্যে তার কী করবে, কতকাল করবে? দেশে কি গরীবের সংখ্যা আছে!'

'তাই বলে চুপ করে বসে থাকবেন?'

কৈলাস হাসল।—'বসে আছি? সারাদিন তো খাটছি, মশায়। অতবড় একটা সংসার ঘাড়ে কতকাল ধরে কত খেটেখুটে তবে না আজ অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল করেছি। ক্ষমতা তো তেমন নেই, কী আর হবে! কত লোক বসে বসে লাখপতি হয়, আমি জীবন পাত করে যা করলাম ছোট একটা বড়ী করতেই ফতুর—তাও ঘরে কুলোয় না। ওদের অবস্থা দেখে প্রাণ কি কাঁদে না মশায়? কখন কি সাধ যায় না এর তিনটে টাকা, ওর পাঁচটা টাকা ছেড়ে দি? তারপর ভাবি তাতে আর লাভটা কী হবে! মাঝখান থেকে আর দশজনের কাছে আদায় করার সুখ থাকবে না। হঠাৎ কারও বিপদ আপদ ঘটল, পাঁচটা টাকা শোধ দিতে উপোস করার অবস্থা হল—তার কথা

আলাদা। তাও খুব হিসেব করে আদায় বন্ধ করতে হয় মশায়! বড়লোক তো নই, নিজের কটা টাকা ফুরিয়ে গেলে দরকারের সময় দু'পাঁচটা টাকাও তো কাউকে দিতে পারবো না।'

কৈলাসকে উত্তেজিত মনে হয়। জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। হঠাৎ সুর বদলে বলে, 'অসলে কথা ক্ষমতা নেই, বড় বড় কথা ভেবে করবো কি বলুন? তাতে একুল ওকুল দু'কুল নষ্ট—ছেলেমেয়েগুলির দু'বেলা পেট ভরে ভাত জুটবে না। তার চেয়ে নিজের যেটুকু শক্তি আছে কারো ক্ষতি না করে—'

কেদার বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। বক্তৃতায় আপনারা খুব পটু। ক্ষতি করেই বা কত ছাড়েন! কবে আপনি আমায় জেলে মাগীর ঘরে যেতে নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায়?'

অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করল, কিন্তু কেদার বিশ্বাস করল না। মুখ ফুটে অবিশ্বাসটা প্রকাশ করলে কৈলাস হয়তো কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মুখের উপর মনুষকে ওভাবে মিথ্যাবাদী বলাও কেদারের পক্ষে বড় কঠিন।

পোস্টাপিসের কাছে ছাড়াছাড়ি হল। কেদারের সঙ্গী একটি ছেলে মন্তব্য করল, 'চাঁই বটে লোকটা। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন, এরকম স্বার্থপর ছোটলোক তো মানুষটা তবু নকুড়, শশী এদের কাছে ওর কী খাতির।'

কেদার বলল, 'খাতির করে, না ডরায়?'

ছেলেটি বলল 'না, ঠিক ডরায় না,। ওকে খুব বিশ্বাস করে।'

বিশ্বাস কৈলাসকে সকলেই করে। লতাপাতা ফুল আর রঙীন কাগজে সাজান পাট খড়ির প্রকাণ্ড মঞ্চের চেয়ে ছোট একটা কাঠের টুলের উপর মনুষের যেমন আস্থা থাকে উচ্ছ্বসিত মমতা আর শুভকামনায় ভরপুর অনেক উদারচেতা-মহাপুরুষের চেয়ে স্বার্থপর কৈলাসকে সেইরকম বেশী নির্ভরযেগ্য মনে হয়। লটারীর টিকিটে লাখ টাকা পাওয়া সম্ভব বটে কিন্তু পাঁচ টাকার নোটে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাবেই। কৈলাসের কাছে কেউ কোনদিন বিশেষ কিছু আশা করে না কিন্তু অমন তো হাজার হাজার লোক আছে যাদের কাছে কেউ কোনদিন কিছুই আশা করে না। জবরদস্তি আদায় করুক, দরকারের সময় পাঁচটা টাকাও তো সে দেয়। সব সময় নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবুক, অপরকে তার সুখ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা তো সে করে না। আবোল তাবোল কথা তো সে বলে না। মানুষকে সে তো ঠকায় না। নিজের দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য তো সে পালন করে। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করুক কারও পাও তো সে চাটে না।

তবে লোকটা বড় স্বার্থপর, এই যা দোষ। একটু অভদ্রও বটে। সেদিন কেদারের বক্তৃতা শুনেই বোধ হয় কৈলাসের মধ্যে পরের ভাল করার জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল। কয়েকদিন পরে সে নিজেই কেদারের বাড়ী গেল, সবিনয়ে বলল, 'সেদিন ওদের সম্বন্ধে যা বলছিলেন, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন তো ঘোষাল মশায়। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে সেদিন থেকে।'

সতরঞ্চি বিছানো চৌকির উপর সে জেঁকে বসল, হেসে বলল,

'বিবেক মশায়, বিবেক মুখে, যে যাই বলুক, অন্যায় করছে মনে হলে বিবেক খোঁচাবেই খোঁচাবে।'

ঘণ্টাখানেক আলাপ আলোচনার পর কেদারের মুখে যখন উগ্র উত্তেজনা আর কৈলাসের মুখে গভীর অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরে তিনজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক আর পাঁচটি কিশোর বসে ছিল, তারা সকলে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই কৈলাসের দিকে চাইতে লাগল। কথা সে আবোল তাবোল বলেছে, অতি-পরিচিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত উলটে দেবার চেষ্টা করেছে, দেশের বৃহৎ ব্যাপারকে রূপ দিতে চেয়েছে ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারের, তবু তার কথাগুলি কি স্পষ্ট আর সহজবোধ্য। এসব বিষয়েও যে কৈলাস মাথা ঘামায়, এতক্ষণ এমন তেজের সঙ্গে তর্ক করতে পারে, কেউ তা কখনো কল্পনাও করেনি। তারপর কৈলাস বলল, 'যাকগে, ওসব বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢুকবে না। একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। আপনি তো মিউনিসিপ্যালিটিতে আছেন, নিজের চোখে ওদের পাড়ার অবস্থা দেখেওছেন অনেকবার, যেমন ধরুন নকুড়ের বাড়ীর সামনে রাস্তাটা—'

কেদার তাড়াতাড়ি বলল, 'চেষ্টা তো করছি। একা কী করব?'

কৈলাসও তাড়াতাড়ি বলল, 'একা কেন? অন্য সকলকে বোঝাতে পারেন না? ওঁরা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওদের যদি না বোঝাতে পারেন—'

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। কেদার অবজ্ঞাভরা তামাসার সুরে বলল, 'আপনি পারেন? দেখুন না একবার চেষ্টা করে!'

কৈলাস গম্ভীরভাবে বলল, 'তাই ভাবছি। তবে ঢুকতেই যা হাঙ্গামা, ভাবতেও ভয় করে! আপনার তো সব জানাই আছে!'

কেদার আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'বলেন কি মশায়, আপনি এবার দাঁড়াবেন নাকি?'

কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'দেখি একবার চেষ্টা করে। আপনি এক কাজ করুন না, আপনি নিজে না ঢুকে আমায় ঢুকিয়ে দিন না?'

প্রস্তাব শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। কৈলাসের মতো স্বার্থপর মানুষের পক্ষেও কি এমন একটা খাপছাড়া প্রস্তাবকে স্বাভাবিক মনে করা সম্ভব?

সেদিন সন্ধ্যার সময় কৈলাস বাড়ীতে বসে আছে, দু'টি কিশোর তার সঙ্গে দেখা করতে এল। কৈলাস দেখেই চিনতে পারল, সকালে তারা কেদারের বৈঠকখানায় বসেছিল।

'কী মনে করে ভাই?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম!'

তখনও নির্ব্বাচনের মাস ছয়েক দেরী ছিল। কিন্তু ধরতে গেলে সেদিন হতেই দু'জনে লড়াই সুরু হয়ে গেল। নির্ব্বাচনের মাসখানেক আগে দেখা গেল লড়াইটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথমটা কৈলাসের বোকামিতে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল

লোকটার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেদারের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার মতো লোকের দাঁড়ানোর কোন মানে হয়? কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল, কৈলাস খুব বেশী বোকা নয়। তার দিকেও অনেক সমর্থক জুটে গেছে! যতই জনপ্রিয় হোক, কেদারের শত্রুও ছিল অনেক, তারা কৈলাসকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। কৈলাসের সবচেয়ে বেশী জুটছে কমবয়সী সমর্থকের দল! এতকাল যারা কেদারের নামে হৈ-চৈ করছে, বডিগার্ডের মত সঙ্গে থেকেছে, তাদেরও কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়েছে।

তবে, ফলটা শেষ পর্য্যন্ত কী দাঁড়াবে বলা যায় না। কেদারের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

এই ঘরোয়া নির্ব্বাচন উপলক্ষে সহর অনেক কাল এ রকম সরগরম হয়ে ওঠেনি। নির্ব্বাচনের অনেকদিন আগে হতেই সকলের মুখে শুধু এই আলোচনা। কৈলাসের দলের ছেলেরা প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, গরীবদের জন্য কৈলাস অনেক কিছু করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করেছে। কৈলাসকে সকলে বিশ্বাস করে।

কৈলাসের দলের প্রচারকার্য্যের বিবরণ শুনতে শুনতে এবং দশজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেদার স্পষ্টই বুঝতে পারছে, এবার তার জয় পরাজয় নির্ভর করছে গরীবের জন্য তার কিছু করবার ক্ষমতায় দশজনের বিশ্বাসের উপর। গরীবদের জন্য সকলের এই অর্থহীন মাথাব্যথায় কেদারের বিরক্তির সীমা থাকে না, রাগে গা জ্বলে

গিয়েছে, কিন্তু গরীবদের পাড়ায় যাতায়াতটা সে বড়িয়ে দিয়েছে অনেক।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছে, নির্ব্বাচনের অর বাকি আছে মোটে তিনটে দিন, একদিন বিকেলে ওই গরীবদের মধ্যে একটা দাঙ্গাবাধবার উপক্রম দেখা গেল। উপলক্ষটা একটু খাপছাড়া। নকুড়ের বাড়ীর কাছে একটা ফাঁকা মাঠ আছে। কেদার আর কৈলাস দুজনের দলের কর্ম্মীরাই গরীবের পাড়ায় পাড়ায় বলে এসেছিল বিকেলে যেন সকলে ওই মাঠে জমা হয়। এই মাঠে এসে কেদার ও কৈলাসের কথা শুনবার জন্য আগেও কয়েকবার তাদের ডাকা হয়েছে কিন্তু একদিন এক সময়ে দুজনের কথা শুনবার জন্য নয়!

নির্ব্বাচন নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ার উত্তেজনা গরীবদের পাড়াতেও যথেষ্ট পরিমানে সংক্রামিত হয়েছিল। বহুলোক মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। তারপর কী ভাবে যেন অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে।

সভা আহ্বানের ভুলটা প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে টের পেয়ে কেদার ও কৈলাস সভায় আসেনি। দুজনেই পরম উদারতার সঙ্গে অপরকে সভায় কথা বলার সুযোগটা দান করেছে। কিন্তু পরস্পরে উদারতার খবর না পাওয়ায় দু'জনের একজনও সুযোগটা গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

খবরের জন্য উৎসুক হয়ে কৈলাস ঘরে বসেছিল। হন্তদন্ত হয়ে নকুড় ও একটি ছেলে এসে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনার খবরটা দিল। শুনে জুতা পর্য্যন্ত পায়ে না দিয়ে ফতুয়া গায়ে কৈলাস ছুটে গেল

কেদারের বাড়ী। ব্যাপারটা কেদারকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'শীগগির যাই চলুন।'

'কোথায় যাব মশায়? ওই দাঙ্গার মধ্যে?'

'আপনি আর আমি গেলে দাঙ্গা বাঁধবে না। চলুন, চলুন, দেরী করবেন না!'

কেদার মাথা নেড়ে বলল, 'এতক্ষণে বেধে গেছে—এখন গিয়ে কী হবে!—মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে।'

কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না।

শত্রুমিত্র

আদালতের বাইরে আবার দেখা হয় দুজনের, পানবিড়ি চা মুড়ি মুড়কি আর উকিল মোক্তারের দোকানগুলির সামনে। দু'জনে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। তীব্র বিদ্বেষের আগুণে যেন পুড়ে যায় দু'জোড়া চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় রসুল একটা অকথ্য কুৎসিৎ কথা বলে। কথাটা দামোদরের কাণে যায় ন, ভিতরের হিংসার ধাক্কাতেই সে হাত দুটো মুঠো করে রসুলের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তে, উচ্চারণ করে বিশ্রী একটা অভিশাপ, তারপর লাল কাঁকর বিছানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হন হন করে চলতে আরম্ভ করে কিছুদূরের বড় বটগাছটার দিকে।

বটের ছায়ায় অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। গাছটার গোড়ার দিকে ঘেঁষে বসে চাঁপা আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার মুখের ভাবটা ভ্রূকুটিগ্রস্ত। পাশে বসে বিড়ি টানছিল দেবর মহেশ্বর। মহেশ্বরের তৈলহীন রুক্ষ চুলে নিখুঁত ভাঁজের টেরি।

দুপুরের ঝাঁঝালো রোদে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। বটের বিস্তীর্ণ গাঢ় ছায়া পর্য্যন্ত গরম। প্রতাপগড়ের বাস ছাড়বে সেই বিকেলে, আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর। এখানেই সময় কাটাতে হবে সে পর্য্যন্ত।

'ফের আসতে হবে তোমাকে?' চাঁপা শুধোয়।

এগার বছরের পুরনো উড়নী বাঁচিয়ে কোঁচার খুটে কপালের ঘাম

মুছে দামোদর বলে, 'হ্যাঁ, শালারা সময় নিল বেগতিক দেখে। সাতাশ তারিখ।'

একে দুয়ে দামোদরের অন্য সাক্ষীরা এসে সেখানে জোটে, মোট পাঁচজন। মাথার কাপড় চাঁপা আরেকটু টেনে দেয়। আগে অনেক-বার ভেবেছে, এখন অনেকবার ভাবে, তসরে তাকে কি ছাই মানিয়েছে কে জানে—আর কপালের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁদুরের ফোঁটায়। এ বুদ্ধিটা বাতলিয়েছে বুদ্ধিমান কেদার উকিল। হাকিম নাকি পরম ধার্ম্মিক। এসব দেখলে মন ভেজে। কিন্তু কই ভিজল বুড়োর মন, ওরা আব্দার করতেই তো মুলতুবী করে দিল। মরণও হয়না বুড়ো শকুনটার!

সাক্ষীরা তাদের গাঁয়েরি লোক। মামলা মুলতুবি হওয়ায় তারা খুসী না অখুসী হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। অহঙ্কারে শীর্ণ বুক ফোলা-বার চেষ্টা করে সক্রোধে তারা ঘোষণা করে যে রসুল মিয়াকে আজ শেষ করে দিয়েছিল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে চালাকি করে। তারা যেন সত্যই রাগ করেছে। অথচ সাক্ষী দিতে আসবার সুযোগ অনেকদিন বাড়ল বলে, আবার কিছু আদায় করা যাবে বলে, ভাবটাও ঠিক যেন তারা চাপতে পারছে না।

সাক্ষীদের মধ্যে গোঁসাই একেবারে চাক্ষুষ। গায়ের গলাবন্ধ ফতুয়াটার মতোই তার মুখ ময়লা, ঢিলে আর ছেঁড়া ছেঁড়া। সে উৎসাহে ফেলে ফেলে বলে, 'ভাবছ কেন ভায়া, তালিম দেয়া মিছে সাক্ষী তো নই যে জেরায় কুপোকাৎ হব। দিক না উকিল যাকে খুসী, করুক না জেরা যদ্দিন পারে। নিক না সময়।'

হলধর সহজ সরল বোকা চাষী।—'আটগণ্ডা পয়সা বেশী দিতে হবে মোকে। নইলে এসবো নি কিন্তু বলে দিলাম, হাঁ।' ভুবন ঘোষ মাইনর স্কুলের মাঝামাঝি মাষ্টার। সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বলে—'কাণ্ড বটে বাবা।' এত বেশী হেসে এরকম একটা সাধারণ মন্তব্য করায় মনে হয় সেই বুঝি ব্যাপারটার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মাথাওলা লোকের মতো। নইলে এমন ভীষণ কাণ্ডে তার কেন মজা লাগবে ?

চাঁপার চোখে জল আসে ! এরা কি নিষ্ঠুর !

হারাধন বাস্তব বুদ্ধির লোক। সে বলে, 'বলি দামোদর, বাস তো ছাড়বে ও বেলা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বাবা। খোরাকী বাবদ কি দেবে বলেছিলে, দাও দিকিনি, খেয়ে আসি।'

শুনে সকলের পেটেই খিদের জ্বালা চাড়া দিয়ে ওঠে, চাঁপার পর্য্যন্ত। সেই কোন সকালে গাঁ' থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছে।

প্রতাপগড়ের একটিমাত্র বাস। প্রতাপগড়ের কাছাকাছি গিয়ে শা'পুরে সবাই নামবে। দামোদরেরা বাসে উঠবার খানিক পরেই সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে নিয়ে রসুলও উঠে জাঁকিয়ে বসে। আদালতে এ পক্ষের আকস্মিক অচিন্তিত চালবাজীতে রসুলের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, ওরা কায়দা করে দিন ফেলে চালবাজীটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়েছিল দামোদর। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। এখন সে দিশেহারা উন্মত্ত আক্রোশ আর নেই, এসেছে গভীর হিংসা আর ঘৃণা। আমি মরি মরব ওকে তো মারব, এই

বেপরোয়া ভাবের বদলে তুজনের মধ্যেই জেগেছে নিজের কোন ক্ষতি না করে অপরের সর্ব্বনাশ করার কামনা—এমন কি পারলে অপরের সর্ব্বনাশ থেকে নিজের কিছু লাভ করে নেবার সাধ! চাঁপা ঘোমটা টেনে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে। বাসে তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে বসে ছিল আগে থেকে, মাঝে মাঝে আড় চোখে সে তাদের দিকে তাকায়। রসুলের দিকে চোখ ফেরাতে তার সাহস হয় না।

সহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। পিছন আর সামনে থেকে ধূলো উড়িয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে লরী চলে যায়, শব্দ পেলেই বাস চালক কানাই গতি মন্থর করে যত পারে নর্দ্দমার ধার ঘেঁযে সরে যায়, লরী পেরিয়ে গেলে গাল দিতে থাকে চাপা গলায়! চাঁপা বসেছে রাস্তার ভেতরের দিকের জানালায়—লরী কিছু দূরে থাকতেই সে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বোজে।

চোখ বুজে থাকারসময়েই একবার প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পাশের বুড়িকে নিয়ে নীচে পাড় যায়। বাসটাও একটু কাত হয়ে থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

একজন গোরা চাঁপাকে পাঁজা কোলা করে তুলবার চেষ্টা করতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য প্যাসেঞ্জারদের তখন ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। তু'তিনজন দরজা থেকে সোজা নালায় গিয়ে পড়ে। কানাই গালাগালি বন্ধ করে চেঁচায়, 'ভয় নেই, ঠিক আছে! ভয় নেই ঠিক আছে!'

ঠিকই আছে কলটা। ডাইনের মাডগার্ডটা শুধু ভেঙ্গেছে আর

বডির খানিকটা তুবড়ে ভেতরের দিকে দেবে গেছে। আর চার ছ'ইঞ্চির জন্য বাসটা উল্টে নালায় পড়েনি।

নালায় যারা পড়েছিল নামতে গিয়ে তাদের একজনের হাত মচ-কেছে, হয় তো ভেঙ্গেছে। সঙ্গী জল কাদা সাফ করে দিলে বাসে উঠে সে কেবলি বলতে থাকে, 'নম্বর নিয়েছ কেউ? নম্বর?'

আরেকজন বলে, 'আরে মশায়, রাখুন। নম্বর! নম্বর দিয়ে হবে কি?'

গাড়ী ছাড়বার আগে কানাই বলে, 'শালারা! যতটুকু উচিৎ তার চেয়ে এক ইঞ্চি যদি সরি—'

'না না, গোঁয়ার্ত্তুমি কোরো না হে।' মাঝবয়সী মোটাসোটা একজন প্যাসেঞ্জার বলে।

'কিসের গোঁয়ার্ত্তুমি? ভয় পেলেই ওশালারা মজা পায়। আমি জানি।'

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্ষেত মাঠ জলায় আর আকাশে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে পড়ার ব্যথা ও দুর্ঘটনার আতঙ্ক চাঁপার মিলিয়ে আসে—নতুন আর একটা লরীর আওয়াজ কাণে আসার সময়টা ছাড়া। ধরে তুলবার ছলে মাতাল গোরাটার অভদ্র কুৎসিৎ স্পর্শটাই সর্ব্বাঙ্গে ভয়ার্ত্ত অস্বস্তিবোধের মত রি রি করতে থাকে। একটা মুখ-ভাঙ্গা বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ওরা আবার মদ খেতে সুরু করেছে। লরীর ধাক্কা লাগার সময় বোতলের মুখটা বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

পাকুনিয়ার মোড়ে বাস আসে। আরও দুজন গোরা উঠে আসে।

হু'জন চাষাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আগের তিনজনের পাশে বসে কিচির মিচির কথা সুরু করে দেয়—একজন হাতের বোতলটা দেখায় তিনজনকে। তিনজন ঘন ঘন তাকায় চাঁপার দিকে, নতুন হু'জন মাঝে মঝে এদিক ওদিকে চোখ ফেরানোর সময়টুকু ছাড়া চাঁপার গায়েই চোখ পেতে রাখে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে। দামোদর আর মহেশ্বর কটকটিয়ে তাকায়। রসুল ভ্রূকুটি করে মুরে হাত বুলোয়। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুখ বার করে দেয় জানলা দিয়ে বাইরে। গাড়ীশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

রসুলের মুখের ভাবটা দেখবার এমন জোরালো ইচ্ছা দামোদরের জাগে! তার কেবলি মনে হয়, তার এই আপমানে রসুলের মুখে নিশ্চয় শয়তানী পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে। তাকাবে না ভেবেও কখন যে সে তাকিয়ে বসে নিজেই টের পায় না। রসুলের মুখে হাসি নেই কিন্তু তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে অনুকম্পা-মেশানো অবজ্ঞাভরা এমন এক মুখের ভাব নিয়ে যার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। চুপচাপ অপমান সহ্য করার জন্য রসুল তাকে মনে করছে অপদার্থ, অমরদ কেঁচো। কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে দামোদরের। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মনে মনে বলে, 'রও। টের পাবে। তোমায় যদি না আমি—' কি করলে যে এ অপমানের প্রতিশোধ রসুল পাবে সে ভেবে পায় না।

চাঁপার দিকে গোরাটার নোটের তাড়া বাড়িয়ে ধরার সবটুকু দোষ গিয়ে পড়ে রস্থলের ঘাড়ে।

রস্থল ভাবে, গোরাটা যদি হাত দিত মাগীটার গায়ে! কি খুসিই সে হত! তাকে জব্দ করতে চালাকিবাজী খেলার মজাটা টের পেয়ে যেত ব্যাটারা। বলবে না ভেবেও আজিজের কানে কানে কখন যে সে কথাটা বলে ফেলে। অজিজ কনুই দিয়ে তার বুকে একটা খোঁচা মেরে হাসতে থাকে।

আধখানা চাঁদ আকাশে উঠেই ছিল। দিনের আলোটা ম্লান হতে হতে এক সময় আধো জ্যোৎস্না হয়ে যায়। শা'পুরের নির্জ্জন রাস্তার মাথায় বাসটা থামলে রস্থলেরাই আগে নেমে যায়।

চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়ে।

আরও একটু দাঁড়িয়ে বাস ছেড়ে দেয়। তখন সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে পাঁচজন গোরা।

শা'পুরের রাস্তা ধরে রস্থলেরা তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা থেকে শা'পুর প্রায় আধক্রোশ তফাতে,আঁকা বাঁকা গাছপালা ঢাকা পথ। প্রথম বাঁকটা ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে রস্থল দেখতে পায়, চাঁপারা জোরে জোরে পথ হাঁটতে স্থরু করেছে, তাদের কয়েক হাত পিছনে আসছে গোরারা।

বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ক্ষেত মাঠ জলা জঙ্গলের মুখর

স্তব্ধতা ঝম ঝম করে চারিদিকে। তারই মধ্যে চাঁপার অর্ত্তনাদ শুনে রসুল ও তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়ায়।

কি হয়েছে তাদের বলে দিতে হয় না। ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুটি মূর্ত্তি ছুটে এসে তাদের পাশ কাটিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়ে যায় গ্রামের দিকে—গোঁসাই আর ভূবন ঘোষ।

হলধরও ছুটছিল, এদের দেখে সে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'ভাই সর্ব্বনাশ। ছুটে এসো।'

অজিজ, বলে 'যা যা আচ্ছা হয়েছে।'

তখন বোধ হয় সরল সহজ হলধরের খেয়াল হয়, ওরা কারা এবং এরা কারা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায় চাঁপার আর্ত্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়।

হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, 'চল যাই'।

অজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে।'

'লাঠির কাছে বন্দুক?' বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি···এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন···তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশাকরি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন···]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ীর চৌমাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জ্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের

পোড়া মাহুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয় তো কামড়েছে দু'একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয় তো তেড়ে গেছে ঘেউ ঘেউ করে, গরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। এ পথের আশেপাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্য্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্ত্তিক চক্রবর্ত্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশেপাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ীর পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবী করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ী বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্য্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ী—মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় হু'জন লোক চলেচে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রঙ ছাড়া হু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অর্থাৎ, লম্বায় চওড়ায় হু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয় নি। রাঘব মালাকরের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমানসাইজ ঘরে-কাচা আধপুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরনো ছিটের সার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

•

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। হু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি ? আজ তোর হয়েছে কি র‍্যা ?'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ ?' আঙ্গুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্‌স ! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু ! এত কাপড় জন্মে দেখি নি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড় ? কাপড় কিরে

ব্যাটা? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি মালদিয়া! ব্যাটার বুদ্ধি কত!'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই তো বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ী নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।'

'কে বলেছে তোকে? কার কাছে শুনলি?' সভয় গর্জ্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

'কে বলবে বাবু? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা?'

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু কজন, না আরও অনেকে?

'তোকে চার টাকা মজুরি দি রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে? তোকে বিশ্বেস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু?'

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্য্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে অগুন্তি—দু'মাস আগে পর্য্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রীপুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নেমকহারামি ঠাকুর-বাবু? বলছ নেমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশীবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায় মোরা বলতে যাই নি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুসী হয়ে, 'চটিস কেন? আটআনা বেশী পাবি আজ, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহয্যে। গৌতম তাকে ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে: কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ী আর মালদিয়ার প্রায় মাঝা-মাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খান ত্রিসেক ঘর আছে,

আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্য্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙ্গুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে খ্যান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু!'

সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন, মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্তু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নীচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামে নি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে! গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছম ছম করে গৌতমের। এই জলাজঙ্গল, কুঁড়ে পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরনো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা

মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি! খেয়ে দেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চেখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—' গৌতম ঢোক গেলে, 'একজোড়া কাপড়! নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমেয় ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জ্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—

'ন্যাংটো তো ধরে ধরে…'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিৎ কথা বলা উচিৎ হয় নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য্য গাল দেওয়া। দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই যুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তুগাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গ-প্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়-গুণো, তা তো শুনলে না।'

'নে না কাপড়গুণো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা ?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্ত সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব! পুলিশ আসবে

সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

ছুটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দেঁড়িয়ে রইছ কেনে? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্ত্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে, কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জ্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জ্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্য্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা'টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে' গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চোরাবাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এপথে মাল নিয়ে আসি,

তোরাই বুঝে ছ্যাখ। পুলিশ কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার ?'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করি নি মেরা।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন! বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর ? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে আটঘাট বেঁধে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। নাথগঞ্জের গগন সা'র প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তরিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড়

বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পত্তুগাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পত্তুগাঁয়ে গিয়ে পুলিশ ছ্যাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেকে। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

যাকে ঘুস দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিসপিস করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ী জোরে চললে তার কোন আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামী মোটর চড়ে-বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়, এত দামী, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে সহরের পিচ্-ঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরণ হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরনো, সস্তা, বাজে মোটর গাড়ীর চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রাম বাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব্ব বেশী। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দ্দশা আজ বড় বেশী মনে হওয়ায় ট্রাম-বাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার। মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে

চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ-করা গরীবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরী কিনা একশ' টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবে চিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জান্তাম।'

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জান্তে?'

'জান্তাম বৈকি! বড় হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জান্তাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম——'

'সত্যি! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

সুশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বলো, দাস সাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাস সাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে!'

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে!'

'এমনি দিয়েছে? অত ঘুষ কে দিত?'

গাড়ী চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আরেকখানা গাড়ী, দামী কিন্তু পুরনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ী কাছে গেলে পাশপাশি চলতে লাগল দাস সাহেবের গাড়ীটা।

'কোথায় চলেছেন?'

'একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলা-ফিরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্ব্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল। 'আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে।'

দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ীর স্ত্রী বাড়ীতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি। যে-রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে! ওঁর কাছে আমাকে নেহাৎ কচিই দেখায়। দুটি গাড়ীই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ীর হর্ন সুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাস সাহেব নেমে এ গাড়ীতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ গাড়ীর পিছনে আসতে। দাস সাহেব ভেতরে ঢোকা

মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেন নি ?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছো, ইনি আমাদের মিঃ দাস।'

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গীতে একটু হাসে, নববধূর মতো! বৌয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ সুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ী চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বার বার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন ?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা'টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দু'চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিঃশ্বাস আটকে যায়। আজ ক'দিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা

করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম মহরম দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায়! এই দরকারে তাকে দাস খুঁজছিল!

সম্ভ্রান্ত সহরতলীতে দাসের মস্ত বাড়ী। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড় বাড়ীতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বৌ নেই। আত্মীয়স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। সখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দু'চারদিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই আসুক সাহেব বাড়ী নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে সুশীলা, নিজেদের বাড়ীতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানী করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। একথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মসগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না।'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে!'

'বেশীও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পূজো দিয়ে বাড়ী যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। ছুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন।' দাস নিশ্চিন্ত ভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়। সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গম্ গম্ করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা ছুজনেরি মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ!

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা'টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরী কোরো না।'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ী রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও! জোরসে!'

কৃপাময় সামন্ত

রঘুনাথ বিশ্বাসের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় কৃপাময় সামন্তের সামনে একটা সাপ পড়ল। সংকীর্ণ মেটে পথ, পাশের কচুবন থেকে লেজটুকু ছাড়া সবটাই প্রায় বেরিয়ে এসেছে সাপটার, হাত দুই সামনে। পথ পার হয়ে ডাইনে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। বেশ বড় সাপ, কৃপাময়ের পদক্ষেপের স্পন্দন অনুভব ক'রে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে সেই পলকের মধ্যেই লাঠির ঘায়ে ওটাকে মেরে ফেলা যায়। লাঠি উঁচু ক'রে কৃপাময় থেমে গেল। কেন, তা না জেনেই। নাতিকে মারবার জন্যে হাত তুলবার পর আপনা থেকে হাতটা যেমন তার শূন্যে আটকে যায়।

ভোরে সমনে দিয়ে, এত কাছ দিয়ে, সাপ চলে গেলে বোধ হয় কিছু হয়। মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। কৃপাময় ঠিক জানে না। চলতে আরম্ভ ক'রে সে ভাবে, চুলোয় যাক। মঙ্গল অমঙ্গলের এ সব ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ যে পাঠায় সে-ও চুলোয় যাক। সাপটাকে না মারবার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপাশোষ করতে থাকে।

বাগান পেরিয়ে পূব-পাড়ার বাড়িগুলি, কয়েকটা কাছাকাছি কয়েকটা তফাতে তফাতে, এলোমেলোভাবে সাজানো। পাকা বাড়ি চোখে পড়ে মোটে একখানা। চারিদিকে বর্ষার পরিপুষ্ট জঙ্গল বাড়ির বেড়া ঘেঁষে, ঘরের ভিটা ছুঁয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পাকা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে ভূধর সরকার গুণে নিচ্ছিল মাচার লাউ।

'ছেলের চিঠি পেয়েছো নাকি হে সামন্ত?'

রোজ সে এ প্রশ্ন করে। রোজ কৃপাময়ের পিত্তি জ্বলে যায়।

'আজ্ঞে না। চিঠি পাইনি।'

'এত বিলম্ব করে কেন চিঠি দিতে? চিঠিপত্তর লিখতে তো দেয় জেল থেকে। না স্বদেশী বলে কাড়াকড়ি বেশি?'

'কি জানি।'

ভূধরের বুক লোমবহুল, ভুরু ঘন লোমের মোটা আঁটি। সহানুভূতির সকাতর ধীর উচ্চারণে সে বলে, 'দ্যাকো দিকি ব্যাপার। বলি, তুই একছেলে বাপের, তোর কি স্বদেশী করা পোষায়? কেন রে বাপু, বিয়ে থা করেছিস, ছেলে হয়েছে একটা, কাঁচা বয়েস বৌটার—আঁ, কি বললে?'

কৃপাময় কিছু বলেনি, ভূধরের নিজের মন কথা কয়েছে কৃপাময়ের হয়ে। এসব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। ভূধর বোধ করে অস্বস্তি আর অপমান। একটু ক্ষোভ জাগে, রাগ হয়। তার যে মনে পড়েছে তার ছেলে একটা নয়, যোয়ান মদ্দ পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এটা যেন কৃপাময়েরই ব্যঙ্গ করা তাকে। সে যাবে কৃপাময়ের একমাত্র ছেলের জেলে-যাওয়া নিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে আর তার মনে পড়বে তার পাঁচ ছেলের কথা? এসব লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভাল। কতদিন সে ভেবেছে কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলার, গায়ে পড়ে যেচে কথা

বলার স্বভাবটা ত্যাগ করবে, তবু যে কেন দেখা হলেই ওর সঙ্গে সে কথা কয় !

'মামলাটার কী হোলো সরকারমশায় ?'

এ প্রশ্ন তো করবেই কৃপাময়। বড় ছেলে তার ঘুষের মামলায় পড়েছে, এখন সে মামলার কথা না তুললে ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ হবে কেন। কড়া কথা ঠেলে আসে ভূধরের মুখে, বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার বাহাদুরী রাখো সামন্ত—কিন্তু মুখেই আটকে যায় কথাগুলি। কেন কে জানে !

'চলছে। মামলা চলছে। সাজানো মামলা, ফেঁসে যাবে।'

কৈফিয়তের মতো শোনায়, আবেদনের মতো। তার ছেলে লোক খারাপ নয়, মামলা সাজানো। কৃপাময় বিশ্বাস করুক, মামলা সাজানো। থুতু ফেলার বদলে ভূধরঢোক গিলে ফেলে। নিমের দাঁতনের জন্যেই নিজের থুতুটা বড় তেতো লাগে সন্দেহ নেই।

'ওরা খুব খুশি হয়েছে, না সামন্ত ? গাঁয়ের লোক ? খুব ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে ?'

এ-কথা ওকে আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, ভূধর ভাবে। কৃপাময়ও তো গাঁয়ের লোক। ওরা খুশি হয়ে থাকলে কৃপাময়ও তো খুশি হয়েছে নিশ্চয়। এক মুহূর্তের জন্যে বড় অসহায়, বড় করুণ দৃষ্টিতে ভূধর তাকায় কৃপাময়ের দিকে, সে যেন সারা গাঁয়ে বিরোধী মতের, শত্রু ভাবের, ঘৃণা ও হিংসার প্রতিনিধি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কৃপাময় জবাব দেবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধাতস্থ হয়। সে ভাবটা কেটে গেলে তখন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্যে মাথাটা

কেমন ঘুরে উঠেছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, পেট গরম হয়েছিল। কেন যে বাড়ির সবাই খাও খাও ক'রে তাকে এত বেশী খাওয়ায়! আজ সাবধানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। দাঁত মেজেই স্বর্ণসিন্দুর খাওয়া চাই।

বিরক্তি চেপে ভেবেচিন্তে কৃপাময় জবাব দেয়, 'ঢাক পিটে বেড়াবে কে?'

শুনে ভূধরের মনে হয়, কৃপাময় যেন বলতে চায়, তোমার ছেলের কীর্তির কথা ঢাক পিটে রটাবার দরকার হয় না, সবাই জানে। কি আস্পর্দা লোকটার, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা কয়, এমন ভাসা ভাসা উদাসীনভাবে, অবজ্ঞার সঙ্গে। আর নয়। আর একটি কথা সে বলবে না ওর সঙ্গে। নাই পেলে এরা বেড়ে যায়। কৃপাময়ের দিকে প্রায় পিছন ফিরে ভূধর এবার মাটিতে থুতু ফেলে।

কৃপাময় একটু ইতস্তত করে। তার কি উচিত লোকটাকে একটু সাবধান করা? ফল হয় তো কিছুই হবে না, তবু বলতে বোধ হয় দোষ নেই। দালানের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বুভুক্ষু চোখ, ভূধরের সেজ ছেলে সুরেশ। তাকিয়ে সে আছে দালানের দক্ষিণে বাপের বাঁধানো পুকুরঘাটে, যেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোনো মতে, কিংবা শুধু খানিকটা লজ্জা ঢেকে এসেছে গাঁয়ের ক'জন মেয়ে, না এসে যাদের উপায় নেই, নিরুপায় হয়েও ক'দিন পরে হয়তো যারা আসতেই পারবে না!

'একটা কথা আপনাকে বলি সরকারমশায়।'

'হুম্।' ভূধর ফিরেও তাকায় না।

'আপনার ছেলেকে একটু সাবধান করে দেবেন, ঘোষপাড়ায় যেন না যায়। সবাই-ক্ষেপে আছে ওরা, কি করে বসে ঠিক নেই। বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি ওরা সইবে না, এবার পাড়ায় গেলে হয়তো—'

'কোন ছেলে ? আমার কোন ছেলে বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি করে ?' গর্জন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃপাময়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাটে বৌ-ঝিদের নাইতে ও জল নিতে এবং উপরের ধাপে বসে সুরেশকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে ভূধর আবার নির্জীব হয়ে যায়।

'আপনি যদি কথা দেন ছেলেকে সামলাবেন, আমি ওদের বলতে পারি। নয় তো আমি যদ্দুর জানি ছেলে আপনার খুন হয়ে যাবে।'

'ছেলেটা গোল্লায় গেছে, সামন্ত।'

কৃপাময়ের হাতের চাপে নরম মাঠিতে লাঠির ডগায় টোল পড়ে কয়েকটা। গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। খুন হয়ে ছেলেটার নরকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোষ করে।

'ওকে সহরে পাঠিয়ে দেব আজকালের কধ্যে মেজ ছেলের ওখানে।'

'সেই ভালো।'

পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ! যেন, মহাজন, যেন গুরুঠাকুর, যেন মাষ্টার! ভয় দেখাচ্ছে, যেন পুলিসের দারোগা!

কৃপাময়কে সে কি ভয় করে ? কোনো কারণ তো নেই ওকে তার ভয় করার! তার সম্পদ আছে, লোকজন আছে—কৃপাময় গরীব একা। ছেলের বৌ আর ছেলেমানুষ নাতিটা ছাড়া ওর কেউ নেই। ওর অর্ধেক জমি তার কাছে বাঁধা। ইচ্ছা করলে ওকে সে—

'চললে নাকি সামন্ত? একটা লাউ ছেয়েছিল, নেবে তো নিয়েই যাও আজ।'

'আজ্ঞে ঠিক চাইনি, তবে ছ্যান যদি—'

'দশজনকে দিয়েই তো খাব হে। নইলে এত লাউ দিয়ে করব কি? ওটা নাও, বড়ও হবে, কচিও আছে।'

প্রথম সোনালী রোদ এসে পড়েছে মাটির পথে, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। বর্ষায় পরিপুষ্ট সবুজ গ্রাম। শ্যাম মাইতি আর গোকুল দাসের পোড়া বাড়ির কালো কাঠ-বাঁশ-ছাই আজও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, বর্ষাও ধুয়ে নিয়ে যায়নি, নতুন কুটিরও ওঠেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা, ফিরে এসে নিশ্চয় আবার ঘর তুলবে।

কৃপাময়ের বাড়ির কাছাকাছি সোনা জেলের বৌ কাতু এইটুকু মোটা কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটা কতটা ঢাকল কেয়ার না করে মাথায় মাছের চুপড়ি বসিয়ে তার নিজস্ব কোমরদোলানো ছন্দে হন হন করে চলে, কৃপাময়কে পেরিয়ে গিয়ে থামে। ফিরে এসে আবার তার নাগাল ধরে।

বলে, 'খাসা লাউটি বাঃ। কত নিলে গা?'

'সরকারমশায় দিলেন, কাতু।'

'ওমা, হাঁ নাকি? ছুটি চিংড়ি দি তবে তোমাকে।'

চুপড়ি নামিয়ে একটা কচু পাতা ছিঁড়ে কাতু এক খাবলা চিংড়ি তুলে দেয়।

কৃপাময় বলে, 'পয়সা নেই কাতু।'

কাতু বলে, 'পয়সা কিসের? তুমি মোর বাপ। তোমার ছেলে

মোকে বাঁচালে মিলিটারি থেকে। তোমায় দুটি চিংড়ি দিয়ে পয়সা নোব? ধম্মে সইবে মোর?'

কাতু আরও কিছু চিংড়ি কচু পাতায় তুলে দেয়।

'ছেলে ছাড়া পাবে কবে গো সামন্তমশাই?'

'কতবার শুধোবি কাতু? দেরী আছে, এখনো দেরী আছে।'

'মোকে বলবে, ছেলে কবে আসবে মোকে বলবে! ছেলেকে তোমার রুই খাওয়াবো, পাকা রুই, গোটা রুই আদমুনি। তোমার ছেলে যদি না মোকে বাঁচাত গো সামন্তমশাই—'

কাতুর ওথলানো যৌবনের অশ্লীলতা পর্যন্ত যেন ঢেকে যায় তার চোখ-ছলছলানো মুখের মেঘে। এতক্ষণে কৃপাময় একদণ্ড তার দিকে তাকাতে পারে!

'আয়তো কাতু, খানিকটা লাউ কেটে দি তোকে। দুটি প্রাণী, এ লাউয়ের আধখানাও খেতে পারব না।'

লাউয়ের ফালি নিয়ে চলে গেলে কৃপাময় বলে ছেলের বৌকে, 'লাউ চিংড়ি তো রাঁধবে বাছা, তেল কি আছে?'

'আছে একটুখানি,' বলে কৃপাময়ের ছেলের ছেঁড়া সেলাই-করা গেঞ্জি গায়ে আর কোমরে ভাঁজ খোলা কাঁথার লুঙ্গি-জড়ানো বৌ।

'তাই রাঁধোগে তবে।'

বৌ নড়ে না। চোখ তুলে একবার চায়, চোখ নামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাময়ের সামনে, গেঞ্জি-পরা লুঙ্গি-জড়ানো রোগা প্রতিমার মতো। জলভরা চোখ দেখে কৃপাময়কে একটু ভাবতে হয়। লাউ-চিংড়ি রাঁধতে বলায় তার ছেলের বৌয়ের চোখে জল আসে কেন?

তার ছেলের কথা ভেবে? ছেলে তার বিশেষ করে লাউচিংড়ি খেতে ভালবাসত বলে তো মনে পড়ে না। তাছাড়া তার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কথা ভেবে বৌ চোখে জল আনত না, আড়ালে যেত।

শেষে বুঝতে পেরে কৃপাময় বলে, 'চাল বাড়ন্ত বুঝি মা? তাই তো!'

নেড়ী

দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটটা লাগল তারার মাথায়। তারার ছিল চুলের বাহার, মাথা ভরা চিকণ কাল একরাশি চুল। মাঝে মাঝে কোন কোন মেয়ের এ রকম হয়—চাষাভূষোর ঘরেও। গোড়ায় তেল জুটতো, বাপের বাড়ীতে থাকবার সময় আর শ্বশুরবাড়ী এসে কয়েক বছর, ছেলেমেয়েগুলি জন্মাবার আগে পর্য্যন্ত। তারপর তেলের অভাবে চুল আবার রুক্ষ হয়ে গেছে। ফুলে ফেঁপে থাকে, ঝাঁকড়া জঙ্গলের মতো দেখায়। চুল বড় বেড়ে গেছে মনে হয়। সার না দিলে গগন মাইতির ক্ষেতে ভাল ফসল হয় না, দশটি ছেলেমেয়ে বিয়োবার পরেও তারার মাথায় অযত্নে চুলের ফসল ফলে থাকে অদ্ভুত, সামলাতে তার প্রাণান্ত।

তারপর এলো প্রাণান্তকর অভাবের দিন। ছারেখারে যাবার দিন। দু'দিনে দু'ফোঁটা তেল যা জুটতো তারার মাথায় দেবার, তাও গেল বন্ধ হয়ে। মাথার জট বাঁধে, হু হু ক'রে উকুনের বংশ বাড়ে আর পাগলের মতো মাথা চুলকে চুল ছিঁড়ে তারা বকতে থাকে, 'মলাম্ রে বাবা, মলাম্। মার ভুতো, কাটারি দিয়ে কোপ মার দিকি একটা, চুকেবুকে যাক্।'

ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুধার্ত গগন বিবর্ণমুখে পরামর্শ করতে আসে, বাঁচন-মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না। দু'দণ্ডের বেশী স্থির হয়ে বসতে পারলে তো স্থির করতে পারবে মন! কাতরভাবে

সে তাই বলে, 'কি জানি বাবা, যা যুক্তি কর। চাল বাড়ন্ত ঘরে, বুঝেসুঝে যা যুক্তি কর। দাও, বেচেই দাও।' পেটের জ্বালায় বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি কাঁদে, তারা তাদের থাপড়ে দেয়। কান্না ভেসে আসে শূন্যে এদিক ওদিক থেকে, আতঙ্কে বুকটা মুচড়ে যায় তারার, একটু সময় নড়নচড়ন বন্ধ করে নিথর হয়ে বসে থাকে। তারপর আবার হাত উঠে যায় মাথায়, জট ছাড়াতে, চুলকোতে আর উকুন মারতে! চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখে টিপে পুট্ করে মারবার মুহূর্তটিতে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলায় জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্স্—উকুন মারার পুট্ শব্দের সঙ্গে।

প্রথম মড়া কান্নাটা কিন্তু তার বড়ই জম্‌জমাট হল এই চুলের জন্য। পাঁচনিখে থেকে মেয়ে মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ী আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা চুল ছিঁড়তে লাগল এলোপাথাড়ি চুলেরই যন্ত্রণায়, কিন্তু তার শোকের প্রচণ্ডতা দেখে সবাই হয়ে গেল হতভম্ব। এমন শোকার্ত হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।

তারার কোলের ছেলেটাও ছোট। মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে বলে, 'একটু মাই দেমা ওকে। মোর দুধ শুকিয়ে গেছে।' তারার যেন বাকী আছে বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে! চালের

হাঁড়ি ঝেড়ে সে একটু ধুলো-মেশানো গুঁড়ো বার করে, তাই ফুটিয়ে খাইয়ে দেয় নাতনীকে, শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে।

তিন দিন পরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জন্য তারার কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে। থেমে থেমে তারা সুর করে কাঁদল সারাদিন।

আধপোড়া ভাইবোন দুটিকে খালে ভাসিয়ে দেবার পর সকলের সঙ্গে ভূতো বাড়ী ফিরছে। হৃদয়-পণ্ডিতের বাড়ীর সামনাসামনি সে পেছিয়ে পড়ল। সকলের খানিক পরেই সেও বাড়ী ফিরল, এইটুকু একটা মরা ছাগল ছানাকে গামছায় জড়িয়ে। ছানাটা গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলের মাষ্টার হৃদয় পণ্ডিতের ছাগলের। স্কুল উঠে যাওয়ায় হৃদয় এখন জোতদার পূর্ণ বোযালের ধানের হিসেব লিখছে।

ছাগল ছানার মাংসটা মনা'ই রেঁধে দিল নুন হলুদ দিয়ে, বিনা তেলে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী এসে হবিষ্যিও জুটছিল না বলে ওসব রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে রাঁধতে রাঁধতেই মনা খানিকটা কচি মাংস খেয়ে নিল। এই নিয়ে হাতাহাতি কামড়াকামড়িও হয়ে গেল ভূতোর সঙ্গে তার। আঠার বছরের মনা আর বিশ বছরের ভূতোর মধ্যে।

পরদিন এল হৃদয়-পণ্ডিত। সদর দাওয়ায় শুয়ে ছাগল তার মাই দেয় ছানাকটাকে, আর গলা টিপে ভূতো কিনা চুরি করে আনে সেই ছানা!

'দাম দে ভাল চাস্‌তো গগন। ছেলেকে তোর পুলিসে দেব নইলে।'

'দাম কোথা পাব পণ্ডিতমশাই ?'

মনাকে দেখে হৃদয়-পণ্ডিত যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই বলল, 'তুই কবে এলিরে মনা ? স্বামী মরল কবে ?' ছ'মাস পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে থেকে হৃদয়-পণ্ডিতের চেহারা, তাকানি, কথার ভঙ্গি সব অদ্ভুত রকম বদলে গেছে ; স্কুলটা না উঠে গেলে কি হত বলা যায় না। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে থেঁতো এবং ভোঁতা হয়ে নির্বিরোধ ভাল মানুষ সেজে ছিল, তাই হয়ত সে থাকত শেষ পর্য্যন্ত। পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে ঝড়তি পড়তি উপায়ে টাকা কুড়োতে শিখে হঠাৎ সে মানুষ হয়ে উঠল 'ভাল'টুকুর খোলস ছেড়ে।

ছাগল ছানার জন্য আর বেশী হাঙ্গামা সে করল না। ধমক দিয়ে আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান্ করেই ক্ষান্ত হল। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে জেঁকে বসল গগনের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে। ভিটে ছাড়া কিছুই আর নেই গগনের।

'বাঁধা রাখ। রেখে চলে যা বাপ বেটা রোজগার করতে। ছুটো যোয়ান মানুষ ঘরে বসে না খেয়ে মরছিস্, লজ্জা করে না ?'

যাবার আগে হৃদয়-পণ্ডিত মনাকে বলে গেল, "তুইও দেখছি চুল পেয়েছিস্ মায়ের মতো।"

মনা বল্‌ল, 'উঠেই গেল সব চুল।'

অনেকে গিয়েছে গাঁ ছেড়ে, অনেকে যাই যাই করছে, কেউ আপনজনদের ফেলে একা, কেউ সপরিবারে। ফিরেও এসেছে দু'একজন

—আপনজনদের খুইয়ে। এদের কাছে শোনা গেছে, যাবার ঠাঁই নেই কোথাও। যেখানে যাও সেখানেই এই একই অবস্থা॥

দিনভর পরামর্শ চলল। ভিটে বেচবে না বাঁধা দেবে, গগন আর ভূতো দুইজনেই যাবে না একজন যাবে, অথবা বাড়ীসুদ্ধ যাবে সকলেই। এবং গেলে কোথায় যাবে।

উকুনের কামড় তারা আর তেমন অনুভব করে না, বোধশক্তি আরও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় কোন পরামর্শ-ই সে দিতে পারে না।

ভূতোকে আর দেখতে পাওয়া যায় না পরদিন। হৃদয়-পণ্ডিতের কাছে পথের সন্ধান পেয়ে সে একাই সরে পড়েছে।

গগন বলে, 'একা তোমাদের নিয়ে যাই কোথা? নিজে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।'

বাড়ী বাঁধা রেখে পনের বিশদিনের খোরাক দিয়ে গগন চলে যায়। ফিরে না আসুক পনের বিশদিনের মধ্যে খবর একটা পাঠাবে আর রোজগারের কিছু অংশ।

দুটি দুটি খেতে পেয়ে তারার আবার চুলের যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি বেড়ে যায়। তার ভরা বাড়ী কিরকম খালি হয়ে গেছে আবার বুঝতে পেরে মাঝখানের নিঝুম দিনগুলির পর আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে, মনাও গলা মেলায় মার সঙ্গে। মনার মাথাতেও জট বেঁধে উকুন হয়েছে। মা ও মেয়ে বসে কাঁদে আর পরস্পরের মাথার জট ছাড়িয়ে উকুন বাছে।

খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোন

সংবাদ মেলে না। শোক তুঃখ ও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে তু'জনের। মনার মেয়েটা মরে যায় তুধের অভাবে, কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একই ভাবে। তারপর একে একে, এবেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরও একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে তুটি—মরমর অবস্থায়। দশটির মধ্যে তারার চারটি সন্তান মরেছিল—এদেশে ওরকম মরতে হয় খুব স্বাভাবিক নিয়মে—আর চারটি মরে তুর্ভিক্ষে।

হৃদয়-পণ্ডিত আসে যায়, পরামর্শ দেয়, উপকার করতে চায় কিন্তু চাল দেয় না। পেটে জ্বালা না থাকলে মানুষ কথা শুনবে কেন! বলে, 'চাল পাব কোথায়, চাল? যা বলি শোন। সদরে চল তোমরা; খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেব। গগন যদি ফিরে আসে, তোমরাও ফিরে আসবে।'

তারা বলে, 'আপনি বাপ, যা ভাল বোঝেন করেন।'

তু'জনে রাজি হলে হৃদয় মনে মনে একটু হিসেব কষে দেখে। মনেও আসে চেষ্টাং কৃতের সংস্কৃত শ্লোকটা। তাই মনাকে আড়ালে বলে, 'যা করছি সব তোরই ভালর জন্যে মনা। কিন্তু চারজনের ব্যবস্থা কি করতে পারব? খট্‌কা লাগছে। মা না গেলে তুই যদি না যাস—গেলে কিন্তু সুখে থাক্‌তিস্‌। মাছ তুধ খাবি, শাড়ী গয়না পাবি—'

'বলেছি যাব না?'

'বলিসনি? বলিস্‌নি তো? বেশ বেশ।'

তারার অজান্তেই মনাকে শাড়ী গয়না পরিয়ে মাছ তুধ খাইয়ে

সুখে রাখবার জন্য শহরে পাঠিয়ে নিজের মাছ দুধ খাবার আর স্ত্রীকে শাড়ী গয়না দেবার ব্যবস্থাটা হৃদয়-পণ্ডিত করতে পারল।

মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের সমস্ত দিনটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে দুই ছেলেকে নিয়ে তারা গেল হৃদয়-পণ্ডিতের বাড়ী।

'মেয়েটা পালিয়েছে পণ্ডিতমশায়।'

'তাই নাকি ? সত্যি ? ছিছি।'

'মোকে দিন পাঠায়ে সদরে। কি হবে আর ঘর আগলে থেকে ?'

খানিক চুপ করে থেকে হৃদয়-পণ্ডিত বলে, 'ওতে একটু গোলমাল হয়েছে ভূতোর মা। যেখানে পাঠব বলেছিলাম না, সেখানে আর লোক নেবে না খবর পেয়েছি।'

দুই ছেলেকে আগলে তারা ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়। মাথায় তার কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় অজস্র উকুন। সাঁঝ বরণের অন্ধকার চাঁদ উঠে আসায় ফিকে হয়ে আসে। তারা বুঝতে পারে, তার ছেলে দুটো হৃদয়-পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের সেইখানে রেখে তারা চুপি চুপি রাস্তায় নেমে যায়। হাঁটতে আরম্ভ করে সদরের দিকে।

তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে তারার জীবনে। মাসখানেক পরে এক হাসপাতালে আয়নায় নিজের মুখ দেখে তারা প্রশ্ন করে, 'ও কে গো ?'

'দেখ ত চিনতে পার কি-না। ও হল সাতাইখুনির গগনের বউ তারার মুখ।'

তারা হেসেই বাঁচে না।—'দূর ! তারার মাথা ন্যাড়া হবে কেন গো ? কত চুল তারার মাথায় !'

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

যুদ্ধোত্তর যুগে যে বই সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছে

বরেন বসুর

রঙরুট

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

দাম—চার টাকা

যুগান্তর বলেন :—জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। সহস্র গ্রন্থের ভীড়ের মধ্যেও 'রঙরুট' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান থাকিবে।

পরিচয় বলেন :—শান্তির সৈনিকরা এ বই ব্যবহার করতে পারবেন তৃতীয় মহাযুদ্ধে সৈন্য ভর্তির বিরুদ্ধে।

দেশ বলেন :—লেখক বাঙলা সাহিত্যে নবাগত কিন্তু এই প্রথম লেখাতেই তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

গোপাল হালদার বলেন :—রঙরুট-এর ক্ষেত্রটী নিছক কথা সাহিত্যের নয়, নিছক যুদ্ধ-সাহিত্যেরও নয়, উভয়েরই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয়-রসের ক্ষেত্র।